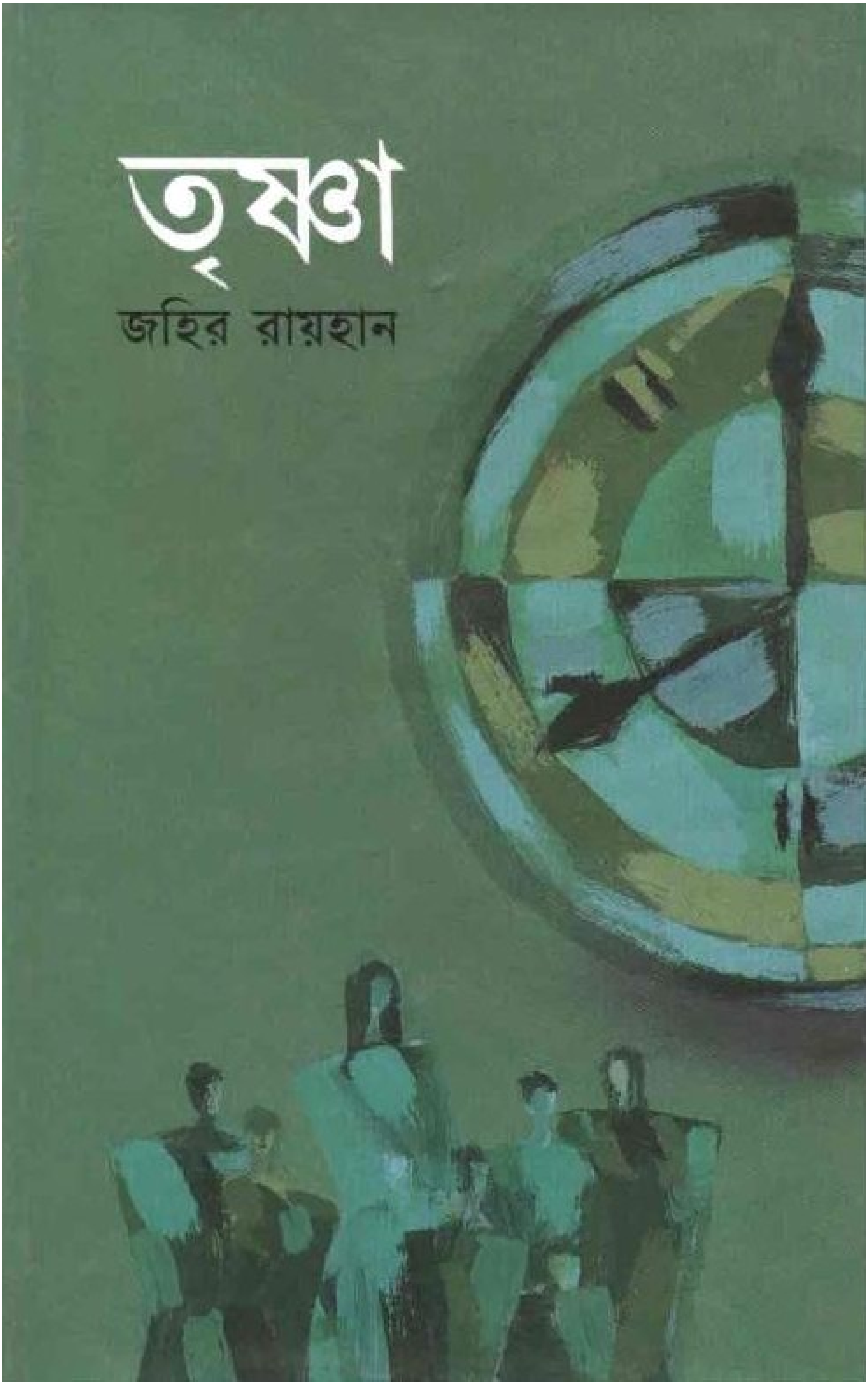
তৃষ্ণা
জহির রায়হান

॥ এক ॥

একটি সুন্দর সকাল।

বুড়ো রাত বিদায় নেবার আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তার শেষ চিহ্নটুকু এখানে-সেখানে ছড়ানো। চিকন ঘাসের ডগায় দু-একটি পানির ফোঁটা সূর্যের সোনালি আভায় চিক্‌চিক করছে।

চারপাশে রবিশস্যের ক্ষেত। হলদে ফুলে ভরা। তারপর এক পূর্ণ-যৌবনা নদী। ওপারে তার কাশবন। এপারে অসংখ্য খড়ের গাদা।

ছেলেটির বুকে মুখ রেখে খড়ের কোলে দেহটা এলিয়ে দিয়ে ; মেয়েটি ঘুমোচ্ছে। ওর মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। ঠোঁটের শেষ সীমানায় শুধু একটুখানি হাসি চিবুকের কাছে এসে হারিয়ে গেছে। ওর হাত ছেলেটির হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখা।

দুজনে ঘুমোচ্ছে ওরা।

ছেলেটিও ঘুমিয়ে।

তার মুখে দীর্ঘপথ চলার ক্লান্তি। মনে হয় অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছিলো ওরা। চুলের প্রান্তে এখনো তার কিছু রেশ জড়ানো রয়েছে।

সহসা গাছের ডালে বুনোপাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেলো। মটরশুঁটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা ধবধবে খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেলো কাছের অরণ্যের দিকে।

খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐকতান। সমতালে এগিয়ে এলো ওরা। যেখানে, ছেলেটি আর মেয়েটি এই পৃথিবীর অনেক চড়াই-উৎরাই আর অসংখ্য পথ মাড়িয়ে এসে অবশেষে এই স্নিগ্ধ সকালের সোনা-রোদে পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার করেছিলো। ভালোবাসি।

বলেছিলো। এই রাত যদি চিরকালের মতো এমনি থাকে, এই রাত যদি আর কোনোদিন ভোর না হয় আমি খুশি হবো।

বলেছিলো। ওই-যে দূরের তারাগুলো, যারা মিটিমিটি জ্বলছে তারা যদি হঠাৎ ভুল করে নিভে যেতো, তাহলে খুব ভালো হতো। আমরা অন্ধকারে দুজনে দুজনকে দেখতাম।

বলেছিলো। হয়তো কিছুই বলেনি ওরা।

শুধু শুয়েছিলো। আঠারো-জোড়া আইনের পা ধীরেধীরে চারপাশ থেকে এসে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের।

ওরা তখনো ঘুমুচ্ছে।

তারপর।

॥ দুই ॥

আমার কোনো জাত নেই।

মাংসল হাতজোড়া ভেজা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বুড়ো আহমদ হোসেন বললো, আমার কোনো জাত নেই। আমি না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-ইহুদি, না-খৃষ্টান। আমায় জাত তুলে কেউ ডেকেছো কি এক ঘুষিতে নাক ভেঙে দেবো বলে দিলাম।

আশেপাশের টেবিলে যারা ছিলো তারা বিরক্তির সঙ্গে একনজর তাকালো ওর দিকে।

ছোকরা গোছের একজন দূর থেকে চিৎকার করে বললো, বুড়ো বাটার ভীমরতি হয়েছে। রোজ এক কথা। বলি এ পর্যন্ত ক'টা লোকের নাক ভেঙেছো শুনি?

আহমদ হোসেনের কানে সে কথা পৌঁছলো না। কপালে জেগে-ওঠা চামড়ার কোঁচগুলো বাঁ-হাতে মুছে নিয়ে সে আবার বলতে লাগলো, আমি কিছু মানি না। না জাত। না ধর্ম। না তোমাদের আইন কানুন। এর সবটুকুই ফাঁকি। চোখে ধুলো দেবে মানুষ ঠকানোর কারসাজি। শুনতে যদি ভালো না-লাগে, নিষেধ করে দাও তোমাদের এই আঁস্তাকুড়ে আর আসবো না। এখানে চা খেতে না এলেও আমার দিন কাটবে।

আহা চটছেন কেন, আমি কি আপনাকে আসতে বারণ করেছি কোনো দিন। না, করছি? চা খানার মালিক নওশের আলী তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

কিন্তু, বুড়ো চুপ করলো না।

কাপ থেকে খানিকটা চা পিরিচে ঢেলে নিয়ে মুখের কাছে এনে আবার পাত্রটা নামিয়ে রাখলো সে। হয়েছে, ওসব মিষ্টি কথায় মন ভোলাতে চেয়ো না। ছেলেটাকে যখন কুড়ি বছর ঠুকে দিলো তখন কোথায় ছিলো সব? একটা নয়, দশটা নয়, একটি মাত্র ছেলে আমার। কোর্টশুদ্ধ লোক বললো বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে আর হাকিম কিনা সাজা দিয়ে দিলো আঁ!

পনেরো বছর আগে সাজা পাওয়া এক এবং একমাত্র ছেলের চিন্তায় আহমদ হোসেনের চোখজোড়া সজল হয়ে এলো। বয়সের চাপে কুঁচকানো মাংসের বেষ্টনী ভেদ করে জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো বাদামি চায়ের ঈষৎ উষ্ণ পেয়ালায়।

বুড়ো কাঁদছে।

শওকত তার চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো। ওর ইচ্ছে হলো এ-মুহূর্তে একবার বুড়ো আহমদ হোসেনের পাশে গিয়ে বসতে। চায়ের কাপটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে দুটো কথা বলতে ওর সঙ্গে।

কিন্তু থাক।

যে কাঁদছে সে কাঁদুক।

সান্ত্বনা পাবার সম্ভাব্য সীমা খুঁজে নেবে বুড়ো আহমদ হোসেন।

শওকত জানে। এই দিন যখন শেষ হয়ে যাবে, যখন কালো বোরখায় ঢাকা রাত আসবে, তখন আর এমনি করে কাঁদবে না আহমদ হোসেন। তখন এই শহরের হাজার-ওরা সরু আঁকাবাঁকা গলিতে নামহীন অসংখ্য ছেলেমেয়ের জন্ম-মৃত্যুর হিসেব লিখে বেড়াবে সে। কত হলো?

একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছিয়ানব্বই জন।

কোনো রাতে সহসা কোনো রাস্তার মোড়ে দেখা হয়ে গেলে বুকপকেট থেকে হিসেবের খাতাটা বের করে বলবে, একত্রিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার ছিয়ানব্বই জন। ক্ষয়ে-যাওয়া গুটিকয় কালচে দাঁতের ফাঁকে বিকৃত এক হাসি আমেজ ছড়িয়ে সে বলবে, যাবে একদিন? চলো না কাল রাতে!

না।

ভয় হচ্ছে বুঝি? ওখানে গেলে কেউ তোমাকে চিনে ফেলবে। বদনামের ভয় তাই না? কিন্তু কী জানো, ওখানে যারা যায় তারা কারো কথা মনে রাখে না। ওটাই ও-জায়গার

বিশেষত্ব। আজ পনেরো বছর ধরে দেখে আসছি। আসে আর যায়। বামুন কায়েথ বলো, আর মোল্লা মৌলভী বলো, সব ব্যাটাকে চিনে রেখেছি। দিনের বেলা কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সেজে অফিসে যায়। আর যেই-না সন্ধ্যে হলো, অমনি বাবু মুখে রুমাল গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ে গলিতে।

বলে আবার হাসবে আহমদ হোসেন। একটা আধপোড়া বিড়িতে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আবার সে শুরু করবে এই শহরের নাম-না-জানা অসংখ্য দেহ-পসারিণীর গল্প।

দিন যত যাচ্ছে পিঁপড়ের মতো বাড়ছে ওরা বুঝলে? বাদামতলীর নাম শুনলে তো নাক সিটকাও। আর এই যে নিওনবাতির শহর রমনা ভাবছো এটা একেবারে পিঁপড়ে-শূন্য তাই না? খোদার কছম বলছি, এখানকার পিঁপড়েগুলো আরো বেশি পাজি। শালায় সাহেবের বাচ্চারা ওদেরকে গার্ল বলে ডাকে! যেন, নাম পালটে দিলেই ধর্ম পালটে গেলো আর কী? বলে বিকট শব্দে হেসে উঠবে বুড়ো আহমদ হোসেন। তারপর হিসেবের খাতাটা বুক-পকেটে রেখে দিয়ে আর কোনো কথা না বলে হঠাৎ সে আবার চলতে শুরু করবে। এক পথ থেকে আরেক পথে। অন্য পথের মোড়ে।

বুড়ো আহমদ হোসেন তখনো কাঁদছে।

চায়ের দাম চুকিয়ে কিছুক্ষণ পরে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত।

॥ তিন ॥

লম্বা দেহ। ছিপছিপে শরীর। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, বাতাসের ভার সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু কাছে এসে একটু ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, শুকনো শরীরের মাংসপেশি গুলো অত্যন্ত সবল এবং সজীব। ময়লা রঙের চামড়ার গায়ে অসংখ্য লোমের অরণ্য। হাতে, পায়ে, বুকে এবং কণ্ঠনালী সীমানা পর্যন্ত সে অরণ্যের বিস্তৃতি। রুক্ষ হাতের তালু। খসখসে। অগণিত রেখায় ভরা। চোখজোড়া বড় বড়। মণির রঙ বাদামি। কিন্তু তার মধ্যে কোনো মাধুর্য নেই। আছে এক তীক্ষ্ণ তীব্র জ্বালা। মণির চারপাশে যে-সাদা অংশটুকু রয়েছে তার মধ্যে ছিটেফোঁটা লাল ছড়ানো। কখনো সেটা বাড়ে। কখনো কমে। চোখের খুব কাছাকাছি ভ্রূজোড়ার অবস্থিতি। মোটা। মিশকালো। ধনুর মতো বাঁকা কিন্তু লম্বায় ছোট। চলতে চলতে হঠাৎ যেন থেমে গেছে ওটা। সহসা দেখলে মনে হয়, সারামুখে কোথাও কোনো লাবণ্য নেই। কিন্তু সন্ধানী-দৃষ্টি দিয়ে যাচাই করলে ধীরে-ধীরে একটা অব্যক্ত সৌন্দর্য ধরা পড়ে। যার সঙ্গে আর কারো তুলনা করা যেতে পারে না। মাঝারি নাক। মাংসল। আর ঠিক নাকের মাঝখানটায় একটা কাটা দাগ। চওড়া কপাল। বয়সের সঙ্গে তাল রেখে সামনের অনেকখানি চুল ঝরে পড়ায় সেটাকে আরো প্রশস্ত দেখায়। মুখের গড়নটা ডিম্বাকৃতি। পুরু ঠোঁট জামের মতো কালো। তেমনি মসৃণ আর তেলতেলে। যখন ও হাসে, তখন মুক্তোর মতো দাঁতগুলো ঝলমল করে ওঠে। চিবুকের হাড়জোড়া সুস্পষ্টভাবে উঁচু আর তার নিচের অংশটুকু হঠাৎ যেন একটা খাদের মধ্যে নেমে গেছে। খাদের শেষপ্রান্তে একটা বড় তিল। মাথাভরা একরাশ ঘন চুল। অমসৃণ এবং অনাদৃত।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার আকাশের দিকে তাকালো শওকত। একখানা যাত্রীবাহী বিমান প্রচণ্ড শব্দ করে উড়ে চলেছে পোতাশ্রয়ের দিকে। এক্ষুনি নামবে। তার শব্দ বিলীন হয়ে যাওয়ার আগেই কে যেন পাশ থেকে ডাকলো। বাড়ি যাবেন নাকি?

শওকত চেয়ে দেখলো, মার্থা গ্রাহাম।

মার্থা একটা রিকশায় বসে। শওকতকে দেখে ওটা ঘুরিয়ে দাঁড় করিয়েছে সে। ওর হাতে একটা পাউরুটি আর ছোট একটা চায়ের প্যাকেট।

মার্থা ডাকলো, ব্যাপার কী? এই রাস্তার ওপরে একঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন? বাসায় যাবেন না, আসুন।

শওকত সহসা হেসে উঠলো। আশ্চর্য।

কী?

মনে হচ্ছে আমাকে বাসায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে রোজ আপনি এখানে রিকশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

লজ্জায় মার্থার কালো মুখখানা বেগুনি হয়ে গেলো। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, আমিও কিন্তু এর উলটোটি বলতে পারতাম। কিন্তু বলবো না। তাহলে আপনি রাগ করবেন। মার্থার গলার স্বরে কোথায় যেন একটুকরো ব্যথা ঈষৎ উঁকি দিয়ে গেলো।

শওকত ততক্ষণে উঠে বসেছে রিকশায়।

গলির মোড়ে কামারের দোকানের সামনের কয়েকটা লম্বা টুলের ওপরে যারা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলো, তারা দেখলো। আজও একখানা রিকশা থেকে নামলো মার্থা আর শওকত।

আড়চোখে একবার ওদের দিকে তাকালো শওকত। ওরা দেখছে। ইশারায় দেখাচ্ছে অন্যদের।

যাক, ভালোই হলো। আজ রাতটার জন্যেও কিছু মুখরোচক খোরাক পেলো ওরা। তাদের আড্ডা কথার কাকলিতে ভরে উঠবে। উষ্ণ চায়ের নিকার আর নয়া পয়সায় কেনা নোনতা বিস্কিটের সঙ্গে জমবে ভালো। মার্থা গ্রাহামকে নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করবে ওরা।

কিন্তু কেন? আমিতো ওদের সাতপাঁচে থাকিনে। আমিতো সেই সকালে কাজে বেরিয়ে যাই, আবার রাতে ফিরি। আমিতো কাউকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কারো পাকা ধানে মই দিইনে। তবু কেন ওরা আমাকে নিয়ে অত হল্লা করে?

বলতে গিয়ে ওর নিকষ কালো চোখের মণিজোড়ায় দু-ফোঁটা পানি ছলছল করে উঠেছিলো। সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে শওকতের দিকে তাকিয়েছিলো মার্থা গ্রাহাম। সহসা কোনো উত্তর দিতে পারেনি শওকত। ওর শুধু বুড়ো আহমদ হোসেনের কথা বারবার মনে পড়েছিলো। মার্থা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একদিন বুড়ো বলেছিলো, ওটা একটা রোগ। ওটাও একরকমের ক্ষুধা বুঝলে? আজ পনেরো বছর ধরে এই শহরের অলিতে-গলিতে পই-পই করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওদের খুব ভালো করে চেনা আছে আমার। বাদামতলীর ঘাট বলো, ছক্কু মিয়ার চা-খানা কিংবা খান সাহেবের কাফে হংকং বলো, আর তোমাদের ওই বিলেতি ঢঙের যত দেশি ক্লাব—সব ব্যাটার ধর্ম এক বুঝলে। সবাই এক রোগে ভুগছে, এক ক্ষুধায় জ্বলছে। শোনো, কাছে এসো, কানে-কানে একটা মোক্ষম কথা বলে রাখি তোমায়, বয়সকালে কাজে দেবে। শোনো, কোনোদিন যদি কোনোখানে কোনো ছেলে কিম্বা বুড়োকে দ্যাখো কোনো মেয়ের নামে বদনাম রটাচ্ছে, তাহলে জানবে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কিন্তু রয়েছে। বলতে গিয়ে বিকট শব্দে হেসে উঠেছিলো বুড়া আহমদ হোসেন। দাড়ির জঙ্গলে আঙুলের চিরুনি বুলিয়ে দিয়ে পরক্ষণে

আবার বলেছিলো, সেই ছেলে কিম্বা বুড়ো বুঝলে ? তারা যদি কোনোদিন একত্তা কি[illegible] সে-মেয়েটিকে হঠাৎ কাছে পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু জিহ্বা দিয়ে চেটে-চেটে তার পায়ের গোড়ালিজোড়ায় ব্যথা ধরিয়ে দেবে। শুনতানি নয় বাবা, নিজ চোখে দেখা সব। এই শহরের কোন্ বুড়ো কোন্ মেয়েকে নিয়ে কোন্ রেস্তোরায় যায় আর কোন্ মাঠে হাওয়া খায়, সব জানা আছে আমার। বলতে গিয়ে একরাশ থুতু ছিটিয়েছে আহমদ হোসেন।

মার্থাকে নিয়ে রিকশা থেকে নামলো শওকত। পকেটে হাত দিতে যেতে মার্থা থামিয়ে দিয়ে বললো, দাঁড়ান, আমি দিচ্ছি।

বুকের মধ্যে লুকিয়ে-রাখা ছোট্ট ব্যাগটা থেকে কয়েক আনা খুচরো পয়সা বের করলো মার্থা।

সামনে লাল রকটার ওপরে একটা কুষ্ঠরোগী কবে এসে ঠাঁই নিয়েছে কেউ জানে না। হাত-পায়ের নখগুলো তার ঝরে গেছে অনেক আগে। সারা গায়ে দগদগে ঘা। চোয়াল-জোড়া ফুটো হয়ে সরে গেছে ভেতরে। আর সেই ছিদ্র বেয়ে লালাস্রোত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। কাঁধে। বুকে। উরুতে। চারপাশে অসংখ্য মাছির বাসা। ভনভন করে উড়ছে। বসছে। আবার উড়ছে।

রিকশা বিদায় দিয়ে মার্থা আর শওকত ভেতরে এলো। দেড়হাত চওড়া অপরিসর বারান্দার মুখে কে যেন একটা কয়লার চুলো জ্বালিয়ে রেখেছে। তার ধোঁয়োয় চারপাশটা অন্ধকার হয়ে আছে। শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে ওদের। সহসা দুজন মহিলা দু-পাশের করিডোর থেকে বেরিয়ে চিৎকার করতে-করতে উঠোনের দিকে এগিয়ে গেলো।

আরে, মেরে ফেললো তো।

ক্যায়া হুয়া ?

কি অইছে আঁ ?

মার, মার। মার না।

আরে ছাড়, ছেড়ে দে বলছি। নইলে মেরে হাড্ডি-মাংস গুঁড়ো করে দেবো বলে দিলাম।

আরে, আমি বাড়ি মারনেওয়ালী।

ত্রিকোণ উঠোনের মাঝখানে মহিলারা প্রচণ্ড কলহে মেতে উঠেছে। এ ওর চুল ধরে টানছে। ও ওর পিঠের ওপর একটানা কিল-ঘুসি মারছে।

দুটো নেড়ি কুত্তা ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার লাফাচ্ছে আর ঘেউঘেউ করছে।

মাওলানা সাহেব বারান্দায় নামাজ পড়ছিলেন। নামাজ থামিয়ে তিনি চিৎকার করে উঠলেন। জাহান্নামে যাবে সব। হাবিয়া দোজখে যাবে।

এর চেয়ে বড় দোজখ আর কোথাও আছে নাকি ? কে যেন জবাব দিলো জটলার ভেতর থেকে।

বাইরের এই হট্টগোল শুনে মাওলানা সাহেবের তৃতীয় স্ত্রী পর্দার আড়াল থেকে মুখ বের করে তাকিয়েছিলো। সেদিক চোখ পড়তে মাওলানা সাহেব গর্জে উঠলেন। তু ক্যায়া দেখ্তি হ্যায় আঁ ? আন্দার যা।

মেয়েটি সভয়ে পর্দার নিচে আত্মগোপন করলো। উঠোনের কোলাহল চরমে উঠছে।

মার্থা একনজর তাকালো শওকতের দিকে। তারপর আরো দুটো সরু করিডোর পেরিয়ে আরো অনেক দরজা পেছনে ফেলে নিজের ঘরে এসে ভেতর থেকে খিল এঁটে দিলো সে।

শওকত এগিয়ে গেলো সিঁড়ির দিকে।

জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। আলো থেকে এলে পাশের মানুষটাকেও ভালো করে দেখা যায় না। পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে জ্বালালো সে, আর তার আলোতে যেন ভূত দেখলো শওকত। সিঁড়ির নিচে জড়ো-করে-রাখা একগাদা আবর্জনার মাঝখানে জুয়াড়িদের একজন লোক খলিল মিস্ত্রির বউকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে। অভাবিত আলোর স্পর্শে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলো ওরা। তারপর ছুটে পালিয়ে গেলো দুজনে দুদিকে।

বুড়ো আহমদ হোসেন আজ এখানে থাকলে হয়তো পকেট থেকে হিসেবের খাতাটা বের করে তাতে আরো একটা নাম যোগ করতো আর বলতো, এ আর এমন কী দেখলে ভায়া। শোনো, এক সাহেবের গল্প বলি। ব্যাটা দেশি সাহেব। বিলিতি নয়। সেই সাত বছর আগের কথা বলছি, তখন পঞ্চাশের ঘরে বয়স ছিলো ওর। তিন মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। তাদের ঘরে নাতি-পুতিও হয়েছে। একদিন এক স্বদেশি মদের দোকানে বিদেশি মদ খেতে—খেতে ব্যাটা বললে, দেখো আমেদ, আমরা কি রোজ এক রেস্তোরাঁয় বসে খানা খাই? মোটেই না। আজ কাফে হংকংয়ে। কাল লা-শানীতে। পরশু কসবায়। রোজ মুখের স্বাদ পাল্টাচ্ছে। খাবারের ঘ্রাণ বদলে যাচ্ছে। সেখানেই তো আনন্দ। তুমি কি মনেকরো মানুষ কি চিরকাল একরকম খাবার খেয়ে সুখে থাকতে পারে?

এখানে এসে একবার থামবে বুড়ো আহমদ হোসেন। বার্ধক্যের চাপে কুঞ্চিত চোখজোড়া আরো ছোট করে এনে, দাড়ির অরণ্যে এক বন্য হাসি ছড়িয়ে সে আবার বলবে, ওর কথার গূঢ় অর্থ কিছু বুঝলে? আরে ভায়া, চোর যে চুরি করে, তারও একটা দর্শন আছে। খুনি যে খুন করে, সেও জানে, বিনা কারণে সে খুন করেনি।

হাতের কাঠিটা মাটিতে পড়ে যেতে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো চারপাশে। আর আলো জ্বালাতে সাহস পেলো না শওকত। দিয়াশলাইটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে ধীরেধীরে উপরে উঠে এলো সে।

বারান্দায় পাটি পেতে বসে আজমল আলীর বুড়ো মা নাতি-পুতিদের ডালিমকুমারের গল্প বলছে।

'তারপর ডালিমকুমার সাদা ধবধবে একটা ঘোড়ায় চড়ে, ছুটছে তো, ছুটছে তো ছুটছে। হঠাৎ সামনে পড়লো একটা বিরাট নদী। আর তার মধ্যে ইয়া বড় বড় ঢেউ। দেখে তো ডালিমকুমার মহাভাবনায় পড়ে গেলো——'

আরো দুটো সুরু বারান্দা পেছনে ফেলে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো শওকত। তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপ করে বসে পড়লো।

॥ চার ॥

এ-বাড়ীতে কত ভাড়াটে আছে কেউ বলতে পারবে না। ক'টা ঘর হিসেব করে দেখতে গেলে একটা লোক হয়তো একদিন ধরেও কোনো খেই পাবে না। এক করিডোর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বারবার সে ওই একই করিডোরে ফিরে আসবে। কিম্বা ঘর গুণতে গুণতে সে কোথায় গিয়ে হারিয়ে যাবে, আর ফিরে আসার পথ পাবে না।

অনেকের সঙ্গে এ ক'বছরে আলাপ হয়েছে শওকতের। কারো নাম জানে। কারো জানে না। কারো সঙ্গে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হলে স্মরণ-শক্তির বরাত জোরে হয়তো চেহারা

দেখে চিনে ফেলে। এ-বাড়ির ভাড়াটে। দু—একটা কুশল সংবাদ বিনিময়। তারপর ছ—মাসে ন—মাসে আবার চারচক্ষুর মিলন হলো। তখন হয়তো চেনার চেষ্টা করেও বারবার ভুল হয়।

দুয়ারে পায়ের শব্দ হতে ঘুরে তাকালো শওকত। মার্থা গ্রাহাম ভেতরে দাঁড়িয়ে। হাতে ধরে-রাখা পিরিচে এক টুকরো পাউরুটি।

ব্যাপার কী, অন্ধকারে বসে আছেন ? মার্থা অবাক হলো। ঘরের কোণে রাখা হ্যারিকেনটা তুলে এনে শওকতের কাছ থেকে একটা কাঠি চেয়ে নিয়ে ঘরে আলো জ্বালালো মার্থা।

হ্যারিকেনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বললো, রুটিটা খেয়ে নিন। হাতমুখ ধুয়ে অনেকটা সজীব হয়ে এসেছে মার্থা। গায়ের রঙটা কালো। তেলতেলে। টানা টানা একজোড়া চোখ। হালকা ছিমছাম দেহ। তাকালে মনেই হয় না যে, ওর বয়স তিরিশের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। কালো মুখের ওপর পাউডারের হালকা প্রলেপ বুলিয়েছে সে। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ লাল লিপষ্টিক। হাতকাটা একটা গাউন পরেছে মার্থা। সোনালি চুলগুলো কাঁধের দু-পাশে ছড়ানো। প্লেট থেকে রুটির টুকরোটা ওর হাতে তুলে দিয়ে মার্থা আবার বললো, চাকরির কোনো খোঁজ পেলেন ?

না।

সেই ওষুধের কোম্পানিতে যাওয়ার কথা ছিলো আজ দুপুরে। গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ।

ওরা কী বললো ?

বললো, লোক নিয়ে নিয়েছে।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলো না। শওকত একদৃষ্টিতে হ্যারিকেনের সলতেটার দিকে তাকিয়ে রইলো। মার্থা তার হাতের নখগুলো চেয়ে-চেয়ে দেখলো। বাইরে বারান্দায় খুট করে শব্দ হতে সেদিকে ফিরে তাকালো মার্থা।

কয়েকজোড়া সন্ধানী-দৃষ্টি জানালার পাশ থেকে অন্ধকারে আত্মগোপন করলো। হ্যারিকেনের আলো দাড়ানো মার্থা মৃদু হাসলো। তারপর সমানে ঝুঁকে পড়ে চাপাস্বরে বললো। একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন নাতো।

শওকত মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে, বলুন। মার্থা ইতস্তত করে বললো। যতদিন চাকরি না পান, আমার ওখানে খাবেন। কী দরকার শুধুশুধু দুটো চুলো জ্বালিয়ে !

শওকত সহসা কোনো জবাব দিতে পারলো না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে মার্থা আবার বললো। আমি এখন চলি, দেরি হলে আবার রাতকানা লোকটা বেঁকিয়ে উঠবে। আপনি কি বাইরে বেরুবেন ?

না, শওকত আস্তে করে জবাব দিলো।

একটু পরে শূন্য পিরিচটা হাতে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো মার্থা। বলে গেলো—ওই কথা রইলো কিন্তু। শেষে ভুলে যাবেন না। ও চলে যাবার পর অনেকক্ষণ একঠায় বসে রইলো শওকত। মার্থাকে নিয়ে চিন্তা করলো।

সেই কবে, কতদিন আগে আজ মনেও নেই। হয়তো সাত-আট বছর হবে। কিম্বা এগারো-বারো। দেখতে তখন আরো অনেক সুন্দরী ছিলো মার্থা। রোজ সন্ধেবেলা বেকারীতে রুটি কিনতে আসতো। তখন থেকে ওকে চেনে শওকত। সেইসময় ওর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। মাঝে মাঝে মাকে সঙ্গে নিয়ে আসতো মার্থা। সে এক দজ্জাল

মহিলা। মার্থা কিন্তু স্বীকার করতে চায় না। বলে, মায়ের মনটা ছিলো ভীষণ নরম। আপনারা তাকে খুব কাছে থেকে দেখেননি কিনা তাই চিনতে ভুল করেছেন। আসলে কী জানেন, আমার মায়ের জীবনটা বড় দুঃখে কেটেছে। ভরা যৌবন, মানে সেই যুদ্ধের শেষের দিকে মা হঠাৎ বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এক নিগ্রোকে বিয়ে করে বসলেন। আমার তখন বয়স বারোতে পড়ি-পড়ি করছে। মা আমাকে ত্যাগ করলেন না। সঙ্গে নিয়ে রাখলেন। আর ওই নিগ্রোটা, বুঝলেন ? অদ্ভুত লোক ছিলো সে। মাকে ভীষণ ভালোবাসতো। দূর থেকে কদিন আমি তাকিয়ে দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হতো মার বয়স বুঝি আমার চেয়েও কমে গেছে। মা ঘরময় ছুটোছুটি করতো। গলা ছেড়ে হাসতো। অকারণে বিছানায় গড়াগড়ি দিতো। আর হঠাৎ কখনো কী খেয়াল হতো জানি না। দৌড়ে এসে আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমায় চুমায় সারা মুখ ভরে দিতো আমার। একদিন একটা মজার কাণ্ড ঘটেছিলো। এখনো বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেদিন, জানি না কী একটা সুখবর ছিলো। আমি বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, সেই নিগ্রোটা মাকে দু-হাতে কোলে তুলে নিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে। আমাকে দোরগোড়ায় দেখতে পেয়ে মা ভীষণ লজ্জা পেলো। চাপাস্বরে বললো, আহ্, কী করছো। ছেড়ে দাও। মার্থা দেখছে সব। আহ্, ছাড়ো না। মার্থা।

নিগ্রোটার কিন্তু কোনো ভাবান্তর হলো না। সে একবার শুধু ফিরে তাকালো আমার দিকে, তারপর মাকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো। মা তার কোলের মধ্যে চুপটি করে বসে লজ্জায় রাঙা মুখখানা আমার থেকে আড়াল করে বললো, ছিঃ মেয়েটা কী ভাবছে বলতো।

নিগ্রোটা কিছু বললো না। শুধু ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

তারপর!

কী আশ্চর্য। একদিন সকালে নিগ্রোটা তার কাজে বেরিয়ে গেলো। আর ফিরলো না।

একদিন। দু-দিন। এমনি করে একটি মাস, একটি বছর কেটে গেলো। যে গেলো সে আর এলো না। মা কত কান্নাকাটি করলেন। গির্জায় গিয়ে কতবার কত নামে যিশুকে ডাকলেন। কিন্তু কিছুই হলো না। পরে একদিন শুনলাম, সেই নিগ্রোটা তার দেশে, তার ছেলেমেয়ে আর বৌয়ের কাছে ফিরে গেছে।

সেই থেকে মা যেন কেমন বদলে গেলেন। আর সবকিছুতেই একটু হেসে কথা বলতে গেলে তিনি ভীষণ রাগ করতেন। যেন আমি মস্তবড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলছি এমনি একটা ভাব করতেন তিনি।

হ্যাঁ, তাই যেদিন ওর মা সঙ্গে আসতো, সেদিন একেবারে চুপটি করে থাকতো মার্থা। কারো সঙ্গে কথা বলতো না। কোনোদিকে তাকাতো না। আর যেদিন সে একা আসতো, সেদিন ওকে দেখে অবাক হতো সবাই। কথা বলছে। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজছে। আর দুষ্টুমি-ভরা দৃষ্টি মেলে তাকাচ্ছে এদিক-সেদিক।

তারপর একদিন এক অক্সেনওয়ালার ছেলের পিটার গোমসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো ওর। ভিক্টোরিয়া পার্কের গির্জায় অনেক আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে পিটারের হাতে বিয়ের আংটি পরিয়ে দিলো মার্থা গ্রাহাম।

তখন ওর চেহারায় অন্য এক জীবনের চমক এসেছে। স্বামীকে নিয়ে মার্কেটিঙে বেরোয় মার্থা। সিনেমায় যায়. রেস্তোরাঁয় খায়। রাতে বল নাচে।

কিছুদিনের মধ্যে বেশ মুটিয়ে গেলো মার্থা। তারপর অনেকদিন ওর কোনো খোঁজ পায়নি শওকত। মাঝে একবার শুনেছিলো, একটা মৃত সন্তান প্রসব করেছে সে। ঢাকা ছেড়ে চাটগাঁয়ে আছে স্বামীর সঙ্গে। এর মধ্যে একদিন বেকারীতে রুটি কিনতে এসে হু হু করে কেঁদে উঠলেন মার্থার মা। হিসেবের খাতাটা বন্ধ করে রেখে বোকার মতো ওর দিকে চেয়েছিলো শওকত। মার্থা মারা গেছে।

আমার মেয়ে মার্থা, ও আর বেঁচে নেই। ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছলেন তিনি। রুমাল ভিজে গেলো কিন্তু অশ্রুর অবাঞ্ছিত বন্যা থামলো না।

হ্যারিকেনের সলতেটা আরো কমিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলো শওকত।

নিচের সেই কলহ এখন থেমে গেছে। যার-যার ঘরে ফিরে গেছে ওরা। নেড়িকুত্তা দুটো উঠোনের এককোণে যেখানে কয়েকজন জুয়াড়ি তাসের আসর জমিয়ে বসেছে সেখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

একটা চোখ বন্ধ করে দিয়ে আরেক চোখের খুব কাছে এগিয়ে এনে সাবধানে তাস খেলছে খলিল মিস্ত্রী। কেউ যদি দেখে ফেলে সেই ভয়ে। সবকিছুতেই অমনি সাবধানতা গ্রহণ করে সে। রোজ সকালে যখন কাজে বেরিয়ে যায় তখন বাইরে থেকে ঘর তালা দিয়ে যায় খলিল মিস্ত্রী। বউ ভেতরে থাকে। রাতে বাইরে থেকে ফিরে আসার সময় ঠোঙায় করে বউয়ের জন্যে সন্দেশ নিয়ে আসে খলিল। ওর চোখেমুখে আনন্দের চমক। তালা খুলে ঘরে ঢুকে বউকে অনেক আদর করে খলিল মিস্ত্রী। কাছে বসিয়ে সন্দেশ খাওয়ায়।

বুড়ো আহমদ হোসেন বলে—এটাও একটা রোগ বুঝলে? এক রকমের ক্ষুধা। একজনকে অনন্তকাল ধরে একান্ত আপন করে পাওয়ার অশান্ত ক্ষুধা। ঈর্ষা থেকে এর জন্ম। ঈর্ষার এর মৃত্যু। এ ব্যাটারা কবিতা পড়ে না বলেই এদের অধঃগতি। মনে নেই সেই কবিতাটি? সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। আবার সেই হাসি। কালচে দাঁতের ফাঁকে হাসছে বুড়ো আহমদ হোসেন।

শওকত দেখলো, তিনটে তাসকে পরম যত্নে হাতের চেটোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে খলিল মিস্ত্রী। সে যদি জানতো, যে-লোকটি তার পাশে বসে তাস খেলেছে; যার সঙ্গে দিনের পর দিন সে হাসি-ঠাট্টা আর কৌতুকে মশগুল হয়ে পড়েছে, সে-লোকটা আজ সন্ধ্যায় অন্ধকারে সিঁড়ির নিচে তার বউকে নিয়ে শুয়েছিলো। সে যদি জানতো, যে-তালা দিয়ে সে তার বউকে রোজ বন্ধ করে যায় তার আরেকটা চাবি এর মধ্যে তৈরী হয়ে গেছে, তাহলে? খলিল মিস্ত্রী এর কিছু জানে না। হয়তো কোনোদিন জানবেও না। তার অজ্ঞানতা তাকে শান্তি দিক।

নিচে, থিয়েটার কোম্পানির ছেলেমেয়েরা গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে নাচের মহড়া দিচ্ছে। কয়েকটা ছেলে-বুড়ো-মেয়ে এসে জুটেছে সেখানে। মহড়া দেখছে। হাসছে। কথা বলছে।

বেশ আছে ওরা। শওকত ভাবলো।

বউ-মারা কেরানিটা উঠোন পেরিয়ে উপরে আসছে। রোজকার মতো আজও দেশি মদ গিলে এসেছে সে। পা টলছে। ঠোঁট নড়ছে। পরনের পাঞ্জাবিটা পানের পিকে ভরা।

শওকতের গা ঘেঁষে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো সে। এর পরে অনুচ্ছেদটুকু অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারে শওকত।

বউ-মারা কেরানিটা ধীরে ধীরে তার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাবে না। তারপর হঠাৎ তার রুগ্ণা বউটির কান্নার আওয়াজ শোনা যাবে। বালিশে মুখ চেপে কাঁদবে সে।

তাসের জুয়ো যেমনি চলছিলো, তেমনি চলবে।

নাচের মহড়া থামবে না।

মাওলানা সাহেব বারান্দায় বসে একমনে তছবি পড়ে যাবেন।

শুধু উঠোনে বসে-থাকা নেড়িকুত্তা দুটো উপরের দিকে চেয়ে ঘেউ-ঘেউ করবে। আর বাইরের রকে বসা কুষ্ঠরোগীটার দু-চোয়ালের ছিদ্র দিয়ে একটানা লাভা ঝরবে।

নির্লিপ্ত রাত্রির নীরবতায় শিহরণ তুলে রুগ্ণা বউটি আরো অনেকক্ষণ ধরে কাঁদবে। তারপর যখন তার কান্না বন্ধ হয়ে যাবে, তখন রাতকানা লোকটার দোকানঘরে তালা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে মার্থা। মার্থা গ্রাহাম। মায়ের দেয়া নাম।

॥ পাঁচ ॥

আলনা থেকে ময়লা জামাটা নামিয়ে পরলো শওকত।

শুকনো চুলের ভেতরে আঙুলের চিরুনি বুলিয়ে নিলো। বাইরে বেরুবে সে। গন্তব্যের কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই।

হয়তো একবার সেই পুরানো বেকারীতে যাবে। কিম্বা, লঞ্চ-কোম্পানির অফিস নাহয় গুজরাটি সাহেবের ওষুধের দোকানে।

একটা চাকরি ওর বড় দরকার। ভাবতে গিয়ে নিজের মনে ম্লান হাসলো শওকত। গত উনিশ বছর ধরে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়েও এখনো জীবনের একটা স্থিতি এলো না। প্রথমে খিদিরপুরের জাহাজঘাটে, তারপর এক বাঙালিবাবুর আটাকলে। মাঝে কিছুকাল একটা রেলওয়ে অফিসে। ফাইল ক্লার্ক। তারপর কোনো এক নামজাদা রেস্তোরাঁর কাউন্টারে। ছ-মাস। সেটা ছেড়ে এক মহল-কোম্পানির দালালি করেছে অনেক দিন। এক শহর থেকে অন্য শহরে। ট্রেনে, স্টিমারে। এরপর বছর দুয়েক জনৈক সুতো-ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছে শওকত। তারপর আগাখানী আহমদ ভাইয়ের আধুনিক বেকারীতে। ওখানে বেশ ছিলো কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকতে পারলো না। ছেড়ে দিয়ে একটা আধা-সরকারী ফার্মে টাইম-ক্লার্কের চাকরি নিলো শওকত। দশটা-পাঁচটা অফিস। মন্দ লাগতো না। কিন্তু ফাটা কপাল। বেতন বাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলো। আর তার খেসারত দিতে গিয়ে সাতদিনের নোটিশে অফিস ছাড়তে হলো! সেই থেকে আবার বেকার।

ঘর থেকে বারান্দায় পা দিতেই একজন মোটা মহিলা ঝাড়ু হাতে চিৎকার করতে করতে সামনে দিয়ে ছুটে গেলো। একটা বাচ্চাছেলেকে তাড়া করছে সে। একটা বিড়াল ওদের পিছুপিছু দৌড়ুচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার বাঁকে তিনহাত উঁচুতে দু-পাশে দুটো জানালা। একটা জানালা থেকে আরেকটা জানালায় কে যেন একটুকরো কাগজ ছুঁড়ে দিলো। সেটা যথাস্থানে না-পৌঁছে শওকতের সামনে এসে পড়লো। একেবারে পায়ের কাছে।

মুখ তুলে উপরে তাকালো শওকত।

স্কুলমাষ্টার মতিন সাহেবের মেয়ে জাহানারা জানালার পেছন থেকে মুখ বের করে তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা সরিয়ে নিলো।

আড়চোখে অন্য জানালার দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলো শওকত।

আজম আলীর ছেলে হারুণ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

সিঁড়ি থেকে কাগজের টুকরোটা হাতে তুলে নিলো শওকত। খুলে দেখলো একখানা চিঠি।

মেয়েলি হাতের গুটিগুটি লেখা। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ছাতে এসো। অনেক কথা আছে। দেখা হলে সব বলবো।

চিঠিখানা ধীরেধীরে আবার বন্ধ করলো শওকত। উপরে চেয়ে দেখলো। জাহানারার অর্ধেকটা মুখ আর একজোড়া ভয়ার্ত চোখ অধীর আগ্রহে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চিঠিটা বন্ধ-জানালার কার্নিশে রেখে দিয়ে নিচে নেমে গেল শওকত। করিডোরে একটা বাচ্চাছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। ঝাড়ু হাতে মহিলা গজগজ করতে করতে ফিরে যাচ্ছে উপরের দিকে। বিড়ালটা এখনো ওর পিছুপিছু চলছে।

মার্থার ঘরের দরজায় ছোট্ট একটা তালা ঝুলছে। সূর্য উঠার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে সে। আজ দু–বছর ধরে রাতকানা লোকটার ওষুধের দোকানে কাজ করছে সে। চাটগাঁয়ের খালেদ খান যেদিন তাকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গেলো সেদিন চারপাশে অন্ধকার দেখছিলো মার্থা।

এ চাকরিটা পেয়ে বেঁচে গেছে সে।

মৃত মার্থা। তাকে দেখে প্রথমদিন চমকে উঠেছিলো শওকত। কুড়ি-একুশ বছরের একটা সুদর্শন ছেলের সঙ্গে এ-বাড়িতে এসে উঠলো মার্থা। ঘর ভাড়া নিলো। স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচয় দিলো সবার কাছে। বেশ ছিলো ওরা।

একদিন ওকে একা পেয়ে শওকত জিজ্ঞেস করলো। মা'র কাছ থেকে শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন। সামনে এখন ভূত দেখছি নাতো?

মা? মা'র কথা বলবেন না। মার্থা ভ্রূ কুঁচকে বললো। নিজের ব্যাপারে সবাই অমন অন্ধ হয়। মা যখন বাবাকে ছেড়ে সেই নিগ্রোটার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলো, তখন কোনো অন্যায় হয়নি। আর আমি গোমেসকে ছেড়ে মস্তবড় পাপ করে ফেলেছি, তাই না?

ও। শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। তাহলে লোকে যা বলছে সব সত্যি?

কী?

আপনি এই ছেলেটিকে বিয়ে করেছেন?

না, বিয়ে এখনো হয়নি। হবে। এখানে এসে থামলো না মার্থা। যেন তার মনের অনেক জমে–থাকা কথা কারো কাছে ব্যক্ত করে হালকা হতে চাইছিলো সে। তাই বললো— মায়ের ইচ্ছেকে সম্মান দিতে গিয়ে গোমেসকে বিয়ে করেছিলাম আমি। মিথ্যে বলবো না, ওর সঙ্গে আমি সুখেই ছিলাম। আমি যা চাইতাম সব দিতো সে। যা বলতাম সব করতো। স্বামী হিসেবে ওর কোনো দোষ আমি এখনো দিইনে। খালেদের সঙ্গে গোমেস নিজে আমাকে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলো। একদিন রাতে। একটা বলনাচের আসরে। বলতে গিয়ে থামলো মার্থা। মুহূর্ত–কয়েকের জন্যে কী যেন চিন্তা করলো সে। তারপর হঠাৎ করে বললো—কী আশ্চর্য দেখুন তো, আপনারা সবাই আমাকে কালো বলে

ব্যাপাতেন। মা বলতেন, আমার গায়ের রঙটা নাকি রীতিমতো কুৎসিত। গোমেস অবশ্য এ-ব্যাপারে কিছুই বলতো না। আর খালেদ—ওর কথা কী বলবো আপনাকে, ও সত্যি বড় ভালোবাসে আমায়, নইলে আমার গায়ের এক কালোরঙের কেউ এত প্রশংসা করতে পারে? আমার চোখের মধ্যে ও কী পেয়েছিলো জানি না। বলতে গিয়ে ঈষৎ লজ্জা পেলো মার্থা। মুখখানা নামিয়ে নিয়ে বললো—ও বলতো এত সুন্দর চোখ ও নাকি এ জীবনে দেখেনি। জানেন? রোজ একটা করে ও চিঠি দিতো আমায়, আর কোনোদিন আমাকে একা কাছে পেলে এমন বাড়াবাড়ি করতো যে, আমি নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে যেতাম।

এরপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মার্থা বললো—আজ বিকেলে ও আসুক, আপনার সঙ্গে আলাপ করে দেবো।

তারপর। একমাস। দু-মাস। তিনমাস।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে সত্যি। কিন্তু মার্থার জীবনে তার মায়ের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অমন অবিকলভাবে ঘটে যাবে—সে কথা মার্থা কেন, শওকতও কোনোদিন কল্পনা করতে পারেনি।

করিডোর পেরিয়ে উঠোন এসে নামলো শওকত।

ত্রিকোণ উঠোন, গিজগিজ করছে লোকে।

কেউ কাঠ কাটছে। কেউ থালাবাসন মাজছে। কেউ চুলো ধরিয়েছে। কেউ চান করছে।

বউ-মারা কেরানির মার-খাওয়া বউটি কলের পাশে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা লম্বা ঘোমটা। যেন তার ক্ষতভরা মুখখানা সবার কাছ থেকে আড়াল করে রাখার জন্যে ওটা অত লম্বা করে টেনে দিয়েছে সে।

থিয়েটার-পার্টির একটি মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুল ঝাড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা পুরানো গ্রামফোনে রেকর্ড বাজাচ্ছে ওর সঙ্গীরা।

'ভালোবাসা মোরে ভিখারী করেছে, তোমারে করেছে রানি।'

উঠোন পেরিয়ে সামনের করিডোরে এসে পড়লো শওকত।

বউ-মারা কেরানিটা বাজার থেকে ফিরছে।

জুয়াড়িদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলো। মাছ কত দিয়ে কিনেছেন? কেরানি জবাব দিলো। বারো আনা।

জুয়াড়ি বললো। খুব সস্তায় পাইছেন দেখি।

বাড়ির সদর দরজা পেরিয়ে নেমে এলো শওকত। একফালি রোদের মধ্যে কুষ্ঠরোগীটা চুপচাপ বসে। হাত-পায়ে খুঁটছে আর পিটপিট করে তাকাচ্ছে চারপাশে। অদূরে কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে মার্বেল নিয়ে খেলছে।

শওকত রাস্তায় নেমে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে তাতে আগুন ধরালো।

॥ ছয় ॥

কয়লা-কুড়োন ছেলেমেয়ের দল ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরছে। নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলে চলেছে ওরা। রেলওয়ে ইয়ার্ডের কালো ধোঁয়ার ফাঁকে আকাশ দেখা যায় না। চারপাশে ইঞ্জিনের সিটি আর পুশ-পুশ শব্দ। বিকেলের রোদে চিকচিক করছে রেল-লাইনগুলো। একটা-দুটো করে সেগুলো ডিঙিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলো শওকত। মুখ

তুলে তাকাতে দেখলো, অদূরে একটা পানির ট্যাঙ্কের নিচে হারুণ আর জাহানারা। নিবিড় ভঙ্গিতে পায়চারি করছে আর কী যেন আলাপ করছে ওরা।

শওকতের পায়ের গতি শ্লথ হয়ে এলো।

চারপাশে কত লোক আসছে, কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই। নিবিষ্ট মনে দুজনের কথা শুনছে। এরই নাম বুঝি ভালোবাসা। শওকত ভাবলো। আর ভাবতে গিয়ে নিজের জীবনের একটা অসম্পূর্ণ ছবি সহসা স্মৃতির কোণে উঁকি দিয়ে গেলো ওর।

শহরে নয়, গ্রামে।

আমন ধানের মরশুম তখন। সারামাঠ জুড়ে সোনালি ফসলের সমারোহ। চাষিরা দল বেঁধে ধান কাটছে। গলা ছেড়ে গান গাইছে। ভারায় ভারায় ধান কাঁধে করে বয়ে এনে বাড়ির উঠোনে পারা দিচ্ছে ওরা। ওদের মুখে হাসি, কোমরে লালগামছা জড়ানো। সবার চলার মধ্যে একটা চপল ভঙ্গি। ব্যস্ততার ভাব। চাষিবউদের পরনে লালপাড়ের চেক-শাড়ি। উঠোনে গরু দিয়ে ধান মাড়াচ্ছে ওরা। রোদে মেলে দিয়ে শুকোচ্ছে সেগুলো। দল বেঁধে ধান ভানছে ঢেঁকিতে।

সবার চোখেমুখে মনে এক অসীম আনন্দের আমেজ। তার মাঝে একটি মেয়ে। অনেকটা যেন এই জাহানারার মতো দেখতে। শেখদের ছোট মেয়ে আয়েশা। বারো ছাড়িয়ে তেরোয় পড়ছে। যৌবনের প্রথম ঢেউ এসে সবে তার দেহে প্রথম চুম্বন এঁকে দিয়ে গেছে। তার অপুষ্ট বুক আর অপূর্ণ অধরে তখনো কারো ছোঁয়া লাগেনি।

শীতের শিশির-ঝরা সকালে বাড়ি-বাড়ি মোয়া বিক্রি করে বেড়াতো সে। হঠাৎ কখনো গাছের ডালে পাখি ডেকে উঠলে চমকে সেদিকে তাকাতো। দূরে কোনো রাখালিয়া বাঁশির শব্দ শুনলে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়াতো মেয়েটি। ধানক্ষেতের আলপথ ধরে হাঁটতে গিয়ে কখনো কোনো দমকা বাতাসে গায়ের আঁচলখানা সরে যেতে লজ্জায় রাঙা হয়ে চারপাশে সভয়ে দেখতো আয়েশা। কেউ দেখে ফেললো নাতো?

তখনো সারা গাঁয়ে নবান্নের উৎসব। চাষি-বউরা রসের সিন্নি রেঁধে মসজিদে পাঠাচ্ছে। বাড়ি-বাড়ি নতুন গুড়ের পিঠে তৈরি করছে ওরা। রাতভর পুঁথি পড়া আর কবি-গানের আসর।

এমনি সময়ে আয়েশার খবর শুনে আঁতকে উঠলো সবাই। গ্রাম ছেড়ে দলে-দলে মাঠে ছুটে এলো ছেলে বুড়ো মেয়ে। সোনালি ধানের বুক-উঁচু ক্ষেত। তার মাঝখানে শুয়ে জীবনের শেষ ঘুম ঘুমোচ্ছে আয়েশা। চারপাশের পাকা ধানগাছগুলো অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। অনেকগুলো পাকা ধান ঝড়ে পড়ে আছে শুকনো মাটির বুকে। যে-টুকরিতে করে মোয়া বিক্রি করতো সেটাও পাওয়া গেল অদূরে। মোয়াগুলো সব ছড়িয়ে আছে চারপাশে। সোনালি ধানের কোলে শুয়ে আছে আয়েশা। ওর সারামুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। ওর অপুষ্ট স্তনের কোল ঘেঁষে দুটো ক্ষত। রক্তের একজোড়া ফিনকি বোঁটা ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে একগোছা শীষের ওপরে।

হঠাৎ একটা ট্রেনের তীব্র হুইসেলের শব্দে সম্বিত ফিরে পেলো শওকত। ও যে-লাইনে দাঁড়িয়ে, সেদিক এগিয়ে আসছে ট্রেনটা। ইঞ্জিনের ভেতর থেকে মুখ বের করে বুড়ো ড্রাইভার চিৎকার করে উঠলো, আব্বে হো ক্যায়া?

শওকত তাকিয়ে দেখলো, জাহানারা আর হারুন অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে। এতক্ষণের একান্ত ঘনিষ্ঠ আলাপে ওদের ছন্দপতন ঘটলো।

শওকত নিজেই যেন লজ্জা পেলো। কোন্ দিকে যাবে ঠিক করতে না-পেরে যেদিক থেকে এসেছিলো সেদিকে ফিরে গেলো শওকত।

॥ সাত ॥

কাউন্টারে অনেক লোকের ভিড়।

সবার সঙ্গে একগাল হেসে কথা বলছে মার্থা। সবার সবরকমের চাহিদা চটপট পূরণ করতে হচ্ছে ওকে। ক্রেতাদের হাত থেকে প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে একনজর চোখ বুলিয়েই শো-কেসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। স্যরি। কডলিভার অয়েল ফুরিয়ে গেছে। বিকাডেক্স আছে। বসুন এক্ষুনি দিচ্ছি।

কী বললেন ? হ্যাঁ, সকালে একটা। দুপুরে একটা। আর রাতে ঘুমোবার আগে একটা। আচ্ছা থ্যাঙ্কস্। পয়সাগুলো নিয়ে গিয়ে রাতকানা লোকটার হাতে পৌঁছে দিয়ে আবার কাউন্টারে ফিরে আসছে মার্থা। গুড ইভিনিং মিষ্টার হোসেন, আপনার শরীর এখন কেমন আছে, ভালো তো।

মার্থার চোখেমুখে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা।

ওটাই ওর কাজ।

ক্রেতাদের অসন্তুষ্ট করলে চলবে না। তাদেরকে সবসময় খুব আদরে সোহাগে সম্বোধন করতে হবে। যেন একবার এ-দোকানে এলে বারবার ফিরে আসে।

বুড়ো আহমদ হোসেন বলে, শালার বিকার। বিকার। সব ব্যাটা বিকারে ভুগছে। মেয়ে দেখিয়ে টাকা রোজগারের ফন্দি, খদ্দের বাড়ানোর কারসাজি। পনেরো বছর ধরে অলি-গলি সব চষে ফেললাম আর এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনে। শোনো, এক কেরানির কিচ্ছা বলি। বেতন মাসে দেড়শো টাকা পায়। পরিবারে পুষ্যি হলো আটজন। ষাট টাকা বাড়িভাড়া দিতে হয়, রইলো কত ? আশি টাকা। ওই আশি টাকায় আটটি মানুষ এই শহরে বেঁচে থাকতে পারে ? পারে না। কিন্তু পারছে। ঠিক পেরে যাচ্ছে। বলবো সেটা কেমন করে। তাহলে শোনো, সেই কেরানির একটি মেয়ে আছে। মেয়েটির সবে পনেরোয় পড়ি-পড়ি করছে। যখনি টাকা টান পড়ে তখনি পিতৃদেব কন্যাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সামনের মেসে পাঠিয়ে দেন। না, কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে নিয়ে নয়। টাকা ধার চাইতে। আর ওই-যে মেসের কথা বললাম, ওখানে থাকে আট-দশটি জোয়ান ছেলে। তিরিশের ধারে-পাশে বয়স। বউ চালাবার মুরোদ নেই বলে বিয়ে করতে সাহস পাচ্ছে না, কিন্তু হাজার হোক পুরুষমানুষ তো, মেয়ে দেখলেই মজে যায়। হাতে টাকা না-থাকলেও অন্যের কাছ থেকে ধার করে এনে মেয়েটিকে ধার দেয়। তারপর ধরো, একদিন সে টাকা ফেরত চাইতে এলো কেউ। পিতৃদেব তখন বাড়িতে থেকেও নেই। দরজা খুলে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়ালো। করুণ চোখজোড়া মেলে তাকালো ছেলেটির দিকে। ব্যস্ আর কী চাই। ছেলের মস্তিষ্ক ততক্ষণে গুলিয়ে গেছে। বলতে গিয়ে বিকারগ্রস্ত রোগীর মতো বারবার হাসে বুড়ো আহমদ হোসেন।

বাইরের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাউন্টারে দাঁড়ান মার্থার ব্যস্ততা লক্ষ করলো শওকত। তারপর ভেতরে পা দিতেই মার্থার চোখ পড়লো ওর দিকে।

এসো, আস্তে করে ওকে কাছে ডাকলো মার্থা। দেয়ালঘড়িটার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে বললো, মিনিট দশেক তোমাকে বসতে হবে। তারপরে আমার ছুটি।

আরেকজন খদ্দেরের হাত থেকে প্রেসিক্রিপশন নিয়ে আবার কাজে লেগে গেলো মার্থা।

শওকত বললো, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি।

ঘুরে আসার নাম করে আবার চলে যেয়ো না যেন। শো-কেস থেকে কী একটা ওষুধ খুঁজতে গিয়ে জবাব দিলো মার্থা।

শওকত বললো—না, এই বাইরের ফুটপাতে ঘুরবো। মার্থা বললো, থ্যাঙ্কস্।

ওকে নয়, একজন গ্রাহককে।

কাল রাত থেকে ওরা আপনির পালা চুকিয়ে দিয়ে দুইজনকে তুমি বলে সম্বোধন করছে।

প্রেম নয়। এমনি।

কাল রাতে ভাত খেতে বসে মার্থা বলছিলো— না, আপনি আর আমাকে আপনি-আপনি করবেন নাতো, ভীষণ খারাপ লাগে।

ঠিক আছে, আজ থেকে নাহয় তোমাকে তুমি-তুমিই বলবো। শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে। অবশ্য তুমি যদি আবার আপনি করে ডাকো, তাহলে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাবে।

কেন। আমি আপনার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি যদি আপনি বলি, সেটা ভালোই দেখাবে।

ভালো-মন্দ বুঝিনে বাবা। বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে গিয়ে একদিন শুনে এসো। ছোট-বড় বলে কিছু নেই। খোদা আমাদের সবাইকে এক সঙ্গে তৈরি করেছেন। শুধু দুনিয়াতে পাঠাবার সময় একটু আগে-পরে পাঠাচ্ছেন। বুঝলে?

শুনে শব্দ করে হেসে উঠেছিলো মার্থা। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?

হয়নি। তবে এভাবে আরো মাস-কয়েক বেকার থাকলে মাথাটা আপনা থেকেই খারাপ হয়ে যাবে— বলতে গিয়ে গলায় ভাত আটকে গিয়েছিলো ওর।

একগ্লাস পানি ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে মার্থা উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেছিলো, কী হলো?

ওর কিছু না। পানিটা খেয়ে নিয়ে শওকত জবাব দিয়েছিলো। অন্যের রোজগারের ভাত তো, গলা দিয়ে সহজে নামতে চাইছে না। কথাটা বলে ফেলে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো সে।

মার্থা কিন্তু সহসা কোনো জবাব দিতে পারেনি। শুধু একবার চমকে তাকিয়েছিলো ওর দিকে। তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরেধীরে বলেছিলো, আমি তো তোমাকে বিনে পয়সার খাওয়াচ্ছিনে। যেদিন টাকা আসবে হাতে, হিসেব করে সব চুকিয়ে দিয়ো।

তারপর আর একটা কথাও বলেনি মার্থা।

সকালে যখন ওর ঘরে চা আর নাস্তা পৌঁছে দিতে গিয়েছিলো তখনো চুপ করে ছিলো সে। ওকে নিঃশব্দে চলে যেতে দেখে শওকত পেছনে থেকে ডেকেছিলো, শোনো।

কী।

বিকেলে দোকানে থাকবে তো?

কেন?

না এমনি। ভাবছিলাম ওদিকে একবার যাবো।

দশমিনিটের কথা বলে আধঘন্টা পরে বেরিয়ে এলো মার্থা।

শওকত তখনো ফুটপাতে পায়চারি করছে।

অনেক দেরি করিয়ে দিলাম তোমার। পেছনে এসে বললো মার্থা। তুমি নিশ্চয় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার শ্রাদ্ধ করছিলে, তাই না?

হ্যাঁ, করছিলাম বই-কী!

সত্যি? মার্থার চোখেমুখে হাসি। আজ সকালের মার্থা যেন বিকেলে এসে অনেক বদলে গেছে। একটি ফুটপাত ছেড়ে আরেকটাতে পা দিয়ে মার্থা বললো, শোনো, এখন বাসায় ফিরবো না। একটা ছবি দেখবো আজ।

ছবি! সিনেমা?

হ্যাঁ। তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে। অবশ্য টিকেটের টাকাটা আমি পরে তোমার কাছ থেকে কেটে নেবো। ভয় পেয়ো না। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে এরকম বাকি-বকেয়া চলে।

শওকত বুঝলো। সুযোগ পেয়ে ওকে একটা খোঁচা দিলো মার্থা। সারাদিন কী করে কাটালে? পথ চলতে চলতে মার্থা আবার শুধালো।

শওকত বললো, রোজ যেমন কাটে।

কোথাও গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কিছু হলো।

না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনে। সিনেমা হলের সামনে এসে মার্থা বললো, আজ আমি তোমার কথা একজনকে বলেছি।

কে?

তুমি চিনবে না। আমাদের একজন পার্মানেন্ট খদ্দের, সরকারি অফিসের কর্তাব্যক্তি, দু-চারটে লোককে চাকরি দেয়ার ক্ষমতা আছে ওর।

কী বললে?

বললাম, তোমার একটা চাকরির দরকার। এর আগে আরো অনেক জায়গায় কাজ করেছো। অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর।

কী বলে আমার পরিচয় দিলে?

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে টাকা বের করলো মার্থা। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি টিকেট কিনে এক্ষুণি আসছি। চারপাশের লোকজনকে দু-হাতে সরিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলো মার্থা।

॥ আট ॥

রাতে যখন সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরলো ওরা, তখন পুরো পাড়াটা ক্লান্ত কাকের মতো ঝিমুচ্ছে। শুধু কুষ্ঠরোগীটা এখনো জেগে। ওর চোখে ঘুম নেই।

উঠোনে পা দিয়ে মার্থা চাপা গলায় বললো, ছাতে একটা মেয়ের ছায়া দেখলাম।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ছাতের দিকে তাকালো শওকত।

কোথায়?

আমাদের পায়ের শব্দ শুনে সরে গেছে।

ও কিছু না।

আলকাতরার মতো অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পকেট থেকে দিয়াশলাইটা বের করে আগুন জ্বালালো শওকত।

মার্থা হঠাৎ প্রশ্ন করলো, আচ্ছা তুমি ভূতে বিশ্বাস করো? মানে ঘোস্ট?

হঠাৎ ভূতের কথা কেন?

না, এমনি। বলো না, বিশ্বাস করো?

করি।

কোনোদিন দেখেছো?

হ্যাঁ।

নিজ চোখে?

হুঁ।

সত্যি? মার্থা চোখ বড় বড় করে তাকালো ওর দিকে।

শওকত আরেকটা কাঠি জ্বালাতে জ্বালাতে বললো, দরজা খোলো।

দিয়াশলাই-এর স্বল্প আলোতে তালা খুলে ঘরে ঢুকলো ওরা। মার্থা একটা মোমবাতি জ্বেলে টেবিলের ওপরে রাখলো।

সত্যি, তুমি নিজ চোখে দেখেছো?

কী।

ভূত!

হ্যাঁ। ইচ্ছে করলে তোমাকেও দেখাতে পারি। ওই দেখো। বলে মার্থার পেছনের দেওয়ালে পড়া তার নিজের লম্বা ছায়াটাকে হাতের ইশারায় দেখালো শওকত। নিজের ছায়াটার দিকে তাকিয়ে শব্দ করে হেসে দিলো মার্থা। বাব্বাহ্, আমি ভেবেছিলাম বুঝি সত্যিসত্যি। বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো সে। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। শওকতের দিকে একমুহূর্তে তাকিয়ে থেকে ধীরেধীরে বললো, আমি দেখতে ভূতের মতো, তাই না?

শওকত অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দিলো, আমি কি তাই বললাম নাকি?

ওর কথাগুলো মার্থার কানে গেলো না। মনে হলো সে যেন কী চিন্তা করছে।

শওকত বললো, চুপ করে গেলে যে।

মার্থা ম্লান হেসে বললো, জানো, ছোটবেলায় রাস্তার ছেলেমেয়েরা আমাকে কালো পেত্নি বলে ডাকতো। আমি দেখতে খুব বিশ্রী, তাই না?

বারে, কালো হলে বুঝি কেউ দেখতে বিশ্রী হয়? শওকত সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো। সত্যি বলছি, তুমি কিন্তু রীতিমতো সুন্দরী।

মার্থা মুখ তুলে তাকালো ওর দিকে। ওর চিবুকে। তার চোখে একঝলক লজ্জা আর ঠোঁটময় একটুকরো কৌতুকের হাসি কাঁপছে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আস্তে করে বললো সে, আমি আর সেই বাচ্চাটি নেই বুঝলে। যাকগে, এ কথা বলার জন্যে তোমাকে আজ একটা স্পেশাল খাবার খাওয়াবো। তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও। আমি ওগুলো গরম করে নিচ্ছি।

আরেকটা মোমবাতি ধরিয়ে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো মার্থা।

পাশাপাশি দু-খানা ঘর ওর।

একটাতে ও শোয়।

আরেকটাকে বৈঠকখানা হিসাবে ব্যবহার করে। খানকয়েক বেতের চেয়ার। একটা টেবিল। আর কোনো আসবাব নেই ঘরে। দেয়ালে দুটো ছবি টাঙানো। একটা মাতা মেরীর, শিশু যিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন তিনি, আরেকটা ক্রুশে বিদ্ধ পিতা যিশুর ছবি।

খেতে বসে মার্থা বললো, তুমি এক কাজ করবে।

কী।

তোমার ঘরটা ছেড়ে দাও

তারপর ?

এ-ঘরে এসে থাকো। মার্থা সহজ গলায় বললো, দুটো কামরা আমার কোনো কাজেই আসে না। একটাতে তুমি অনায়াসে থাকতে পারো। ভয় নেই, মাসে ভাড়ার টাকাটা ঠিক কেটে রাখবো। তাতে করে আমারো সুবিধে হবে, আর তুমিও আপাতত নগদ বাড়িভাড়া দেবার হাত থেকে বেঁচে যাবে।

পাগল না মাথাখারাপ, শওকত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো।

মার্থা অবাক হলো। কেন কী হয়েছে ?

শওকত শান্তস্বরে বললো, তাহলে আর এই বাড়িতে থাকতে হবে না। সবাই মিলে ঝেঁটিয়ে বের করবে।

ও। মার্থা এতক্ষণে বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, ঠিক আছে, মাঝখানের দরজাটা নাহয় বন্ধ করে দেবো আমরা। তোমার এক ঘর, আমার এক ঘর। অন্য অনেক ভাড়াটেরা তো ওভাবেই আছে। কি, রাজি ?

শওকত ম্লান হেসে বললো, দাঁড়াও, চট করে কিছু বলতে পারছি না। একটু চিন্তা করতে হবে।

সব কিছুতেই তোমার অমন চিন্তা করতে হয় কেন বলো তো ? মার্থার কণ্ঠস্বরে শাসনের ভঙ্গি। আর কোনো কথা শুনতে রাজি নই। কাল-পরশুর মধ্যে তুমি শিফট করছো।

এর কোনো উত্তর দিতে পারলো না শওকত। শুধু মনে মনে ভাবলো, মার্থা যেন ওর সব-কিছুর ওপরে ধীরেধীরে তার কর্তৃত্বের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবতে গিয়ে মৃদু হাসলো শওকত।

মার্থা ঈষৎ বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, হাসছো কেন ?

শওকত হাসি থামিয়ে বললো, এমনি।

মার্থা মাথা নাড়লো। মোটেই না। নিশ্চয়ই তুমি কিছু ভাবছিলে। মোমের আলো মার্থার মসৃণ ত্বকে একটি স্নিগ্ধ আভার জন্ম দিয়েছিলো।

শওকত আস্তে করে বললো, ভাবছিলাম তুমি একটা আস্ত পাগল।

রাতে কোলাহলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো শওকতের। জেগে উঠে মনে হলো পুরো বাড়িটা ভেঙে পড়বে। ছাতে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, উঠোনে ছেলে বুড়ো মেয়ের ভিড়। সবাই কলকল করে কথা বলছে? হাত-পা ছুড়ছে। কিন্তু কারো কথা স্পষ্ট করে বোঝবার কোনো উপায় নেই।

জেগে উঠেই মার্থার কথা মনে হলো শওকতের। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো সে। সেখানে লোকজনের ভিড়। ওদের কোনো কথা শোনা কিম্বা ওদের কাছে থেকে কিছু জানার অপেক্ষা করলো না শওকত। ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে এলো সে। ওর ধাক্কা খেয়ে কে একজন চিৎকার করে উঠলো। আরে অ মিয়া। চোখে দেহেন না। ধাক্কান ক্যান।

মাঝসিঁড়িতে মার্থার সঙ্গে দেখা হলো। সে উপরে আসছিলো। তার চোখেমুখে উৎকণ্ঠা।

কী হয়েছে। উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলো মার্থা।

কী হয়েছে? প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললো শওকত।

ওহ্। মার্থা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে নিজেকে অনেকটা হালকা করে নিলো সে। আমি ভেবেছিলাম বুঝি তোমার কিছু হয়েছে। ওর বিবর্ণ মুখখানা এতক্ষণে স্বাভাবিককতায় ফিরে এসেছে। উহ্, আমি যা ভয় পেয়েছিলাম। বলতে গিয়ে সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো ওর।

শওকত বললো, কিন্তু।

জুয়াড়িদের একজন চিৎকার করে উঠলো। ওসব কিন্তু-টিন্তু বুঝিনে। বাড়িটা একটা বেশ্যাখানা নয় যে, যার যেমন খুশি তাই করবে।

মাওলানা সাহেব বললেন, তওবা, তওবা। এসব কোন্ দেশি বেলেল্লাপনা আঁ?

শওকত আর মার্থা এতক্ষণ নিজেদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলো যে, এই হট্টগোলের আসল হেতু খোঁজার অবকাশ পায়নি। হাতের কাছে মোহসীন মোল্লাকে পেয়ে শওকত জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে।

অ খোদা, এতক্ষণেও কিছু শোনেননি আপনি? মোহসীন মোল্লা অবাক হলো।

ও কিছু বলার আগে মোবারক আলী বললো, কমু কি হালার, কলিকালের কথা। ছাতের উপরে মতিন সাবে'র মাইয়া আর আজমল সাবে'র ছেইলা। বলতে গিয়ে ফ্যাসফ্যাস গলায় হাসলো সে।

মহসীন মোল্লা ওর অসম্পূর্ণ কথাটা শেষ করে দিয়ে বললো, প্রেম করছিলো। ধরা পড়েছে।

মার্থা তাকালো শওকতের দিকে। ওর চোখমুখ রাঙা হয়ে উঠেছে।

জাহানারাদের ঘরের দরজা-জানালাগুলো সব বন্ধ। লজ্জায় বাইরে বেরোবার সাহস পাচ্ছে না হয়তো। বুড়ো মাস্টার। কারো সাতে-পাঁচে থাকে না। সেই সকালে বেরিয়ে যায়, বিকেলে ফেরে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথা বলে না। আজ দশবছরের ওপরে হলো এ বাড়িতে আছে কিন্তু কারো সঙ্গে কিছু নিয়ে একটু বচসাও করেনি কোনোদিন। এ সময়ে তার মনের অবস্থাটা সহজে অনুমান করতে পারে শওকত। মার্থা বললো,

নাচিয়েদের ওখানে সেলিনা বলে একটা মেয়ে আছে না ! ও নাকি প্রথমে দেখেছিলো বেশ ক'দিন আগে। জাহানারার মাকে ও হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলো। কিন্তু ওর কথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

আজমল আলীর ঘরে বাতি জ্বলছে : ছেলের বাবা তিনি। তার অত লজ্জার কিছু নেই। জোয়ান বয়সে ছেলেরা অমন এক-আধটু ফষ্টিনষ্টি করে। তবু ছেলেকে যে তিনি শাসন করেননি তা নয়। উত্তম-মধ্যম কিছু দিয়েছেন। কিন্তু তার স্ত্রী ইতিমধ্যে খেপে গিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন। জাহানারাদের চৌদ্দ-পুরুষের শ্রাদ্ধ না-করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না তিনি।

মতিন মাস্টারের বন্ধঘরে বাতি জ্বলছিলো। এবার সেটাও নিভে গেলো। প্রতিবাদ করার মতো কিছু নেই ওদের। মেয়ে দোষ করেছে। হাতেনাতে ধরা পড়েছে। লোকে এখন কুৎসা গাইবেই। জোর করে ওদের মুখ বন্ধ করার কোনো মন্ত্র কারো জানা নেই।

বারান্দা আর উঠোনের ভিড়টা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেছে অনেকে। কিন্তু কথার খৈ ফোটা এখনো বন্ধ হয়নি।

শওকত দেখলো বউ-মারা কেরানির বউটা বারান্দার এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঘোমটার ফাঁকে চারপাশে চেয়ে-চেয়ে দেখছে সে।

জুয়াড়িরা বারান্দায় তাস নিয়ে বসে গেছে। বাকি রাতটা আর ঘুমিয়ে কী হবে। ভোরে-ভোরে যারা কাজে বেরিয়ে যায়, ওদেরই দু-একজন ইতিমধ্যে স্নানপর্ব সারার কাজে লেগে গেছে। শওকত বললো, ঘরে যাও মার্থা।

মার্থা বললো, আমার আর ঘুম আসবে না। তার চেয়ে এক কাজ করি শোনো, তুমি বসো। আমি চট করে দু-কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

শওকত কোনো জবাব দেবার আগেই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো মার্থা। বাইরে দু-একটা কাক ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। ভোর হবার আর দেরি নেই।

॥ নয় ॥

না। আর চলে না। এভাবে আর আমি পারছি না মার্থা। শওকতের গলার স্বর ভারি হয়ে এলো। ভাবছি কোথাও চলে যাবো।

কোথায় ?

কোথায় জানি না। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো শওকত। কোনো মফস্বল শহরে গেলে হয়তো কিছু জুটে যাবে।

মার্থা ম্লান হাসলো। ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আস্তে করে বললো, অমন স্বার্থপরের মতো চিন্তা করো কেন।

এতে আবার স্বার্থপরের কী হলো। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো শওকত।

না, তেমন কিছু হয়নি। মুখখানা জানালার দিকে নিয়ে বাইরে তাকালো মার্থা। জাহানারাদের ঘরটা ওখান থেকে দেখা যায়। সে রাতের ঘটনার পরে জাহানারাকে ঘরের ভেতর বন্ধ করে রেখেছে ওর মা।

একদিনে একমিনিটের জন্যেও মেয়েটাকে বাইরে বেরুতে দেয়নি।

ওকে চুপ থাকতে দেখে শওকত পেছন থেকে আবার বললো, স্বার্থপর কেন বললে।

মার্থা বাইরে তাকিয়ে বললো, বললাম তো এমনি। কেন, তোমার কি খুব লেগেছে ? জানালার কাছ থেকে সরে এলো সে। ওর গলার স্বরে ঈষৎ ঝাঁজ। শওকত বললো, তোমাকে বললে তোমারও লাগতো। ওর গলার স্বরে ঈষৎ গাম্ভীর্য। দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো ওরা।

নিচের নাচিয়ের দল জোরে গ্রামোফন বাজাচ্ছে আর হল্লা করছে।

মাঝে মাঝে কী যেন কৌতুক শব্দ করে হেসে উঠছে ওরা।

সহসা মার্থা বললো, ওরা বেশ আছে। বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে উঠলো ওর। শওকত নড়েচড়ে বসলো। মনে হলো যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো সে। ছোট্ট করে বললো, হুঁ।

মার্থা জানালার পাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে একবার দেখলো তাকে। তারপর আবার বাইরে মুখখানা ফিরিয়ে নিলো সে। মোহসীন মোল্লার বউ তার ছ-মাসের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে আর কী একটা ছড়া কাটছে গুনগুন করে। সেদিকে চেয়ে থেকে মার্থা বললো, আমারো আর কিছু ভালো লাগছে না। ভাবছি কোথাও চলে যাবো।

যেতে ইচ্ছে হলে যাও না। আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি নাকি। আমাকে ওসব কথা শোনাচ্ছ কেন ? শওকতের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির আমেজ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘরময় পায়চারি শুরু করে দিলো সে। নাকি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো, তুমি চলে গেলে আমি খাবো কোথায়। চলবো কেমন করে।

আমি কি সে কথা বলেছি তোমায় ? শওকত নিজেও ভাবতে পারেনি মার্থা অত জোরে চিৎকার করে উঠবে। ওর চোখে দু-ফোঁটা পানি টলটল করছে। ঠোঁটজোড়া কাঁপছে। রাগে কিম্বা অভিমানে। দুনিয়াতে শুধু নিজের দিকটাকেই বড় করে দেখতে শিখেছো, অন্যের কথা একটুও ভাবো না।

বাইরে বারান্দায় দু-একজন উৎসাহী শ্রোতার ভিড় জমতে দেখে শওকত চাপা-গলায় বললো, চিৎকার করছো কেন, আস্তে কথা বলা যায় না ?

টপ করে একটা ফোঁটা মাটিতে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে মুখখানা ওর দিক থেকে আড়াল করে নিলো মার্থা। হয়তো একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সে, তারপর অত্যন্ত মৃদু গলায় বললো, চলি। বলে আর সেখানে অপেক্ষা করলো না সে।

টেবিলের ওপরে রাখা হ্যারিকেনের হলদে সলতেটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো শওকত। নিচে কুকুর দুটো সেই কখন থেকে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। এখনো থামেনি। বারান্দায় যারা কান পেতে ছিলো, তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে ঘরে। বউ-মারা কেরানির বউটা মার খেয়ে কাঁদছে।

অস্থিরভাবে অনেকক্ষণ ঘরময় পায়চারি করলো শওকত। কিছুই ভালো লাগছে না। ইচ্ছে করছে দুটো ইট খুলে নিয়ে কুকুর দুটোর মাথা লক্ষ করে মেরে ওদের চিরদিনের জন্যে চুপ করিয়ে দিতে। কিম্বা, বউ-মারা কেরানির বউটির গলা টিপে ধরে বলতে, চুপ করো। না, তাও নয়। ইচ্ছে করছে বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে ছুটে গিয়ে বলতে, কোথায় নিয়ে যাবে বলছিলে আমায়। নিয়ে চলো। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে টেবিলের ওপর থেকে হ্যারিকেনটা তুলে নিলো শওকত। তারপর অকস্মাৎ ওটাকে মেঝের ওপরে ছুড়ে

মারলো সে। ঝনঝন শব্দে হারিকেনের কাচটা ভেঙে টুকরো হয়ে গেলো। শব্দটা বেশ ভালো লাগলো শওকতের।

চারপাশে শুধু অন্ধকার।

মনে হলো যেন সতেরো বছর আগে ফিরে গেছে শওকত। সারা কোলকাতা অন্ধকার। ব্ল্যাক আউট। খিদিরপুরের ডকে একটা আলোও জ্বলছে না।

মাটির নিচে অন্ধকার-সেলারের মধ্যে হাঁটু গুটিয়ে বসে আছে সে। শুধু সে নয় আরো অনেক। ছেলে বুড়ো মেয়েরা পাশাপাশি। একটা প্লেনের শব্দ হলো। দুটো। তিনটে। অনেকগুলো প্লেন ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেলো মাথার ওপর দিয়ে। পরপর কয়েকটা ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে গেলো ওর।

উপর থেকে কিছু মাটি খসে পড়লো নিচে। পায়ের ওপর [illegible] পাশের বুড়োটা চিৎকার করে উঠলো। ইয়া আল্লাহ।

একটা ছেলে একটি যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে [illegible] আছে চুপচাপ, হয়তো শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। একজন মা তার বাচ্চাটাকে সজোরে বুকের মধ্যে চেপে ধরে রেখেছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে। ওর একটা ছোট্ট ছেলে [illegible] তাকাচ্ছে চারদিকে।

বাইরে তখন জাপানিরা বোমা ফেলছে।

কতক্ষণ মনে নেই। অনেকক্ষণ পরে হয়তো। ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে গেলো। একটি অস্থির নীরবতা। তারপর আবার সাইরেন বেজে উঠলো। প্রথমে একটা। তারপর অনেকগুলো একসঙ্গে।

মাটির গুহা থেকে এক-এক করে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। তখনো অন্ধকার। আর ধুঁয়া। মাথায় লোহার টুপি-পরা এ-আর-পি'র লোকগুলো ছুটোছুটি করছে চারপাশে। ওদের হাতে টর্চ, পায়ে [illegible]।

অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে পায়ের সঙ্গে কী যেন লাগছে ওর। ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলো শওকত। একটি মেয়ে। হ্যাঁ, ষোলো-সতেরো বছরের যে মেয়েটা সারাদিন ডাকে ডাকে [illegible] বেড়াতো—[illegible]। নরম বুকটা রক্তে ভিজে আরো নরম হয়ে গেছে। না। বেঁচে নেই। অনেকক্ষণ আগেই মরে গেছে।

শওকতের মনে পড়লো বুক-উঁচু ধানক্ষেতের মাঝখানে শুয়ে-থাকা মেয়ে আমেনা। না আমেনা নয়। ভিখারিনী মেয়ে সকিনা।

না, সকিনাও নয়। মার্থা।

অন্ধকারে একটি দীর্ঘ ছায়ার মতো দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মার্থা।

মার্থা বললো, বেহায়ার মতো আবার এলাম। শওকতের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে ইতস্তত চারপাশে তাকালো সে। বাতি কী হলো?

আমি নিভিয়ে দিয়েছি। অস্ফুট স্বরে জবাব দিলো শওকত। ভেতরে এসো না, কাচে পা কাটবে। শেষের কথাটা বিশেষ জোরের সঙ্গে বললো সে।

মার্থা একবার মেঝের দিকে তাকালো। কিছু দেখতে পেলো না। তারপর মৃদু গলায় বললো, ভেতরে আমি আসবো না। ভয় নেই। তোমাকে একটা কথা জানাতে এসেছিলাম। কাল বিকেলে একবার দোকানে এসো। যে-লোকটাকে তোমার চাকরির কথা বলেছিলাম সে আসবে। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো তোমার। কথাটা শেষ করে আর সেখানে দাঁড়ালো না মার্থা। উত্তরের অপেক্ষা করলো না। খোলা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলো সে।

না। মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছে।

কিছুই ভালো লাগছে না ওর।

রাত এখন ক'টা বাজে কে জানে। কুকুরগুলো এখন আর চিৎকার করছে না। বউ-মারা কেরানির বউ কান্না থামিয়ে চুপ করে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে সে। কিম্বা মাতাল স্বামীর সেবা করছে। সারা বাড়িতে কেমন একটা ভয়াবহ নির্জনতা। যেন মানুষজন কেউ নেই।

হঠাৎ নিজেকে বড় একা মনে হলো ওর। মনে হলো এই অন্ধকার-ঘরে একা থাকতে ভয় লাগছে আজ। বন্ধ-দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। সারাবাড়িতে গোরস্থানের নীরবতা আর কবরের মতো অন্ধকার। বাড়ির বিড়ালটাও আজ ঘুমুচ্ছে। একবারও তার ডাক শোনা যাচ্ছে না।

সিঁড়ির প্রত্যেকটা ধাপ গুণে গুণে নিচে নেমে এলো সে। সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। হাত দিয়ে পাশের দেয়ালটাকে একবার পরখ করে নিলো। ঠিক আছে। ধীরেধীরে মার্থার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো শওকত।

আস্তে করে একটা টোকা দিলো দরজায়।

কোনো সাড়া নেই।

আরেকটা দিলো। এবার একটু জোরে।

ভেতরে নড়াচড়ার শব্দ হলো। কে। মার্থার গলার স্বর।

শওকত সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি মার্থা। আমি। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না ওর। শুধু একটা অতি ক্ষীণ ধ্বনি বাতাসে ঈষৎ কাঁপন জাগিয়ে মিলিয়ে গেলো।

মার্থা তার ঘরে বাতি জ্বালালো।

দিয়াশলাই-এর কাঠির শব্দটাও কান পেতে শুনলো শওকত । ধীরেধীরে ভেতর থেকে দরজাটা খুললো সে। হাতে ওর একটা মোমবাতি।

শওকতকে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো মার্থা। বিস্ময়ভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলো সে। কিন্তু বলতে পারলো না। শওকত ওর হাতের মোমটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো। তারপর মুহূর্তে মার্থাকে দু-হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলো সে। শক্ত কাঠের মতো একটা দেহ। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করলো মার্থা। পারলো না। ওর শুকনো ঠোঁটে একটা তীব্র চুম্বন এঁকে দিলো শওকত। আরেকটা। আরো একটা।

না। জোর করে ওর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো মার্থা। তারপর ছুটে গিয়ে বিছানায় পড়লো। বালিশে মুখ গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে। মার্থা কাঁদছে।

অসহায়ভাবে একবার বিছানার দিকে তাকালো শওকত। মার্থাকে এভাবে কোনোদিন কাঁদতে দেখেনি সে। কী করবে ভেবে পেলো না। একটু পরে শওকত অনুভব করলো ওর হাত-পা ভীষণভাবে কাঁপছে। আর হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে এসে ধুকধুক শব্দ করছে। হঠাৎ শওকতের মনে হলো মার্থার কান্নার শব্দে যদি বাড়ির সবাই জেগে গিয়ে এদিকে আসে তাহলে ? না। মার্থার এভাবে ডুকরে কান্নার কোনো কারণ খুঁজে পেলো না শওকত। যেন কেউ মারা গেছে ওর। মার্থা বিলাপ করছে। শওকত সভয়ে তাকালো চারদিকে। তারপর ধীরেধীরে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

অন্ধকার, একহাত দূরে কী আছে বোঝা যায় না। পুরো বাড়িটা তমিস্রায় ঢেকে আছে। একটা ইঁদুর কিচকিচ শব্দ তুলে পায়ের ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ভয়ে থমকে

দাঁড়ালো সে। নিজের নিশ্বাসের আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া পর শওকতের মনে হলো— আশেপাশের দেয়ালগুলো যেন দেখতে পাচ্ছে সে। এ দিকে আলো বাড়ছে। শওকত অবাক হলো, সিঁড়ির দিকে না গিয়ে পথ ভুল করে উঠোনে চলে এসেছে সে। এবার রীতিমতো ভয় করতে লাগলো ওর। হাত-পাগুলো অস্বাভাবিকভাবে কাঁপছে। পথ হাতড়ে আবার সিঁড়ির দিকে ফিরে এলো শওকত।

কোথায় একটা বাচ্চাছেলে হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে গিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছে। মা ছড়া কেটে শান্ত করার চেষ্টা করছে তাকে। ঘরে ফিরে এসে দরজায় খিল এঁটে দিলো শওকত। সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে ওর। যেন একটা প্রচণ্ড জ্বর এসে গায়ে এইমাত্র ছেড়ে গেলো। দরজায় হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সে। গলার নিচে ধুকধুক শব্দটা কমেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর। কলসি থেকে এক-গ্লাস পানি ঢেলে ঢকঢক করে সবটা খেয়ে নিলো শওকত।

॥ দশ ॥

পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো ওর, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। আড়মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে শুলো সে। চোখ খুললো। মেঝেতে অনেকগুলো কাচের টুকরো ছড়ান। দিনের আলোয় চিকচিক করছে। আবার চোখ বন্ধ করলো শওকত। সারাদেহে কী এক আলস্য। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। শুয়ে শুয়ে কাল রাতের কথা ভাবলো সে। আর তক্ষুণি মার্থার কথা মনে পড়লো ওর। মনে পড়লো রাতে ওর ঘরে যাওয়ার কথা। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলো শওকত। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এলো। দালানের মাথার ওপর দিয়ে কড়া রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। এত বেলা পর্যন্ত এর আগে কোনোদিন বিছানায় শুয়ে থাকেনি সে। মার্থা কি এসেছিলো সকালে ? হয়তো এসেছিলো। ওর কোনো সাড়াশব্দ না-পেয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু দরজায় ধাক্কা দিলে নিশ্চয় জেগে যেতো শওকত। না, মার্থা আসেনি। কাল রাতের সে ঘটনার পর হয়তো মনে মনে ওকে ঘৃণা করছে মার্থা।

মার্থা আর আসবে না।

ভাবতে গিয়ে বুকের নিচে একটা চিনচিন ব্যথা অনুভব করলো সে।

নাচিয়ে দলের মেয়ে সেলিনা কলতলায় চান করেছে। একটা তোয়েলে দিয়ে হাত-পা-মুখ রগড়াচ্ছে মেয়েটা। শূন্যদৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলো শওকত। ওর দিকে চোখ পড়তে লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি নগ্ন পা-জোড়া ভেজা কাপড়ে ঢেকে দিলো সেলিনা। শওকতের কোনো ভাবান্তর হলো না। মেয়েটা আড়চোখে আবার তাকালো। মৃদু হাসলো সে।

বারান্দা থেকে সরে আবার ঘরে এলো শওকত। কী করবে বুঝতে পারছে না। খিধে পেয়েছে ভীষণ। কিছু খাওয়া দরকার। মগে করে পানি এনে বারান্দায় মুখ ধুতে বসলো সে।

আজমল আলীর ঘরের সামনে লোকজনের ভিড়। দেশের বাড়ি থেকে কয়েকজন আত্মীয়-স্বজন এসেছে। হারুনের বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে ওরা। না। জাহানারার সঙ্গে নয়। আজমল আলীর নিজের বোনঝির সঙ্গে। স্কুলে পড়ে মেয়েটা। বিষয়-সম্পত্তি আছে।

হাতমুখ মুছে কাপড় পালটালো শওকত। ঘরময় কাচের টুকরোগুলো এখনো ছড়িয়ে রয়েছে। থাক। জাহান্নামে যাক সব। বাইরে বেরুবার পথে ভাঙা হ্যারিকেনটাকে অকারণে একটা লাথি মেরে ঘরের কোণে সরিয়ে দিয়ে গেলো সে।

মার্থার ঘরের দরজায় একটা তালা ঝুলছে। ভোরে-ভোরে বেরিয়ে গেছে সে। জাহান্নামে যাক মার্থা। আপনমনে বিড়বিড় করে উঠলো শওকত।

বাহার যা রাহে ক্যয়া? পেছনে মিহি কণ্ঠের আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ালো সে।

নাচিয়ে দলের মেয়ে সেলিনা তার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একখানা তোয়ালে দিয়ে মাথার চুল ঝাড়ছে। সামনে পড়ে-থাকা একরাশ ঘন কালো কুন্তল পিঠের ওপরে সরিয়ে দিয়ে মেয়েটি আবার বললো, বাহার যা রাহে ক্যয়া।

শওকত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। এ প্রশ্ন হঠাৎ কেন, বুঝতে পারলো না সে। কাঁচা হলুদের মত গায়ের রঙ। তামাটে চোখ। গাঢ় বাদামি অধর। মার্থার চেয়ে দেখতে অনেক বেশি সুন্দর সেলিনা। অনেক বেশি জীবন্ত।

ক্যয়া দেখ রাহে। মুখ টিপে পরিমিত হাসলো মেয়েটি। অকারণে লজ্জায় রাঙা হয়ে তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়টা টানতে গিয়ে আরো একটু সরিয়ে দিলো।

শওকত আস্তে করে বললো, কিছু না। বলে যাবার জন্যে পা বাড়ালো সে। কোথায় যাচ্ছেন বললেন নাতো। এবার উর্দুতে নয়, বাংলায় প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

শওকত ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, বাইরে যাচ্ছি, কাজে। কেন, কিছু বলবেন নাকি?

হ্যাঁ।

বলুন।

ভেতরে আসুন, বলছি। অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রূজোড়া বাঁকালো মেয়েটি। ঠোঁটের কোণে এক রহস্যময় হাসি।

ইতস্তত করে ভেতরে এলো শওকত। আমার একটু তাড়া আছে। কী বলবেন তাড়াতাড়ি বলুন।

বলছি। অমন অধীর হচ্ছেন কেন, বসুন। চুলগুলো ধীরেধীরে খোঁপাবদ্ধ করলো মেয়েটি।

ছোট্ট ঘর। প্রায় শূন্য। একটা চৌকি। এলোমেলো বিছানা। তাকে কতকগুলো শিশি-বোতল জড়ো করা। একটা ভাঙা আয়না। চিরুনি। কোণায় দড়ির ওপরে কতগুলো ময়লা কাপড়। পুরানো একটা ট্রাঙ্ক। চিত্রতারকাদের ছবিতে ভরা কয়েকটা ক্যালেণ্ডার।

কাল রাতে নিচে এসেছিলেন কেন? দেহটা ভেঙে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালো মেয়েটি। সারা মুখে তার দুষ্টুমি-ভরা হাসি।

শওকতের মাথায় যেন বাজ পড়লো। ইতস্তত করে বললো, তার মানে?

কাল রাতে নিচে এসেছিলেন কেন? প্রত্যেকটা কথার ওপরে জোর দিয়ে টেনে-টেনে প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

অবাক হয়ে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো শওকত। তারপর দৃঢ় গলায় বললো, আপনি কি বলতে চান?

আমি কী বলতে চাই। অপূর্ব গ্রীবাভঙ্গি করলো সেলিনা। বাঁকা চোখে ওর দিকে একটু তাকিয়ে অকারণে রাঙা হলো সে। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, আমি বলতে চাই কাল রাতে আপনি নিচে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, এসেছিলাম।

মার্থার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন।

হ্যাঁ, দাঁড়িয়েছিলাম।

ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়েছিলেন। দু-বার।

হ্যাঁ, দিয়েছিলাম

মার্থার হাতে মোমবাতি ছিলো। ফুঁ দিয়ে সেটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

শওকতের গলা দিয়ে আর কথা সরলো না। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো সে। একটা ডাইনি। একটা পিশাচ। শওকতের মনে হলো ওর কলজেটা গলার কাছে এসে আবার ধুকধুক শুরু করে দিয়েছে।

কী, চুপ করে গেলেন যে! বাদামি অধর-জোড়া জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিলো সে। গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত স্বর বের করে বললো, জাহানারার মত ইচ্ছে করলে আপনাকেও ধরিয়ে দিতে পারতাম। দিইনি. মায়া হয়েছিলো তাই।

শওকতের মনে হলো ওর স্নায়ুগুলো যেন ধীরেধীরে অবশ হয়ে আসছে। পা-জোড়া ভীষণ ভারী হেয় গেছে। নাড়তে পারছে না।

সেলিনা ওর হাতের তোয়েলেটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নিন, বড় বেশি ঘামাচ্ছেন। মুছে নিন, আবার শব্দ করে হেসে উঠলো সে। আমিও বাইরে বেরুবো। বসুন, কাপড়টা পালটে নিই। বলে দরজার সামনে থেকে ঘরের কোণে যেখানে একটা দড়ির ওপরে অনেকগুলো ময়লা কাপড় ঝোলানো সেদিকে এগিয়ে গেলো সে। যেতে যেতে বললো, এদিকে তাকাবেন না কিন্তু।

শওকতের সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। ভাবনার গ্রন্থিগুলো যেন সব ছিঁড়ে গেছে ওর। তবু ভাবতে চেষ্টা করলো সে। এখন কী করবে। পেছনে সেলিনার কাপড় পালটানোর খসখস শব্দ।

সহসা শওকত বললো, রাতে ঘুমোন না নাকি ?

ঘুম। বিচিত্র এক ধ্বনি বেরুল মেয়েটির কণ্ঠে। ঘুম আমার আসে না। কেন ?

দরজায় খিল এঁটে ঘুমোতে পারি না বলে। সেলিনা আবার খিলখিল হেসে উঠলো। কাঁচা হলুদ মাংসের দেহটা হরিদ্রা শাড়িতে পেঁচিয়ে নিয়ে শওকতের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। আরো বসতে ইচ্ছে করছে বুঝি ?

শওকত সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো ওর।

করিডোরে কয়েকটা বাচ্চাছেলে মাটির পুতুল নিয়ে খেলা করছে বসে বসে। কলকাতার কতকগুলো এঁটো বাসন ছড়ানো। কয়েকটা কাক সেখানে খাবারের কণা খুঁজছে। কুকুরটা মাঝে মাঝে চিৎকার করে তাড়া দিচ্ছে ওদের। ছুটে যাচ্ছে কিন্তু ধরতে পারছে না। নিষ্ফল আক্রোশ শুধু লাফাচ্ছে।

আরো দুটো করিডোর পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ওরা। কুষ্ঠরোগীটা রকের উপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে। চারপাশে ভনভন করছে মাছি।

না। লোকটা পড়ে গলে পড়বে। কিন্তু মরবে না।

শওকত আপন মনে বিড়বিড় করলো। সেলিনা ওর খুব কাছ ঘেঁষে হাঁটছে। ওর কাঁধটা এসে মাঝে মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে ওর গায়ে। শওকতের সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো। সহসা দৌড়ে গিয়ে একটা চলন্ত বাসের ওপরে উঠে পড়লো সে। পেছনে তাকালো না। তাকাবার সাহস হলো না ওর।

সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে আড়াল-করে-রাখা একজোড়া উদ্ধত যৌবন ওকে পেছন থেকে ব্যঙ্গ করছে। করুক। সামনে এগিয়ে গিয়ে একটা শূন্য সিটের ওপরে বসে পড়লো শওকত। কিন্তু পেছনে তাকানোর লোভের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলো না। আড়চোখে দেখলো, হরিদ্রা শাড়ির আঁচল বাতাসে পতপত করে উড়ছে। স্তম্ভিত বিস্ময়ে বাসটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরেধীরে বাসার পথে ফিরে যাচ্ছে সেলিনা।

॥ এগার ॥

হুঁ, তারপর, বলো বলে যাও, থামলে কেন ? চায়ের কাপটা শব্দ করে পিরিচের ওপরে নামিয়ে রাখলো বুড়ো আহমদ হোসেন। ঘিঞ্জি–গলির মাথায়, দরমায়–ঘেরা রেস্তোরাঁর অসমতল টুলের ওপরে দুজনে বসে।

শওকত বললো, বললাম তো সব। আর কী বলবো।

মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে, কী যেন আটকে ছিলো সেটা বের করলো বুড়ো আহমদ হোসেন। ভেজা আঙুলটা নাকের কাছে এনে শুঁকলো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, শালার তুমি একটা উল্লুক। মেয়েটাকে চুমু দিতে গিছলে কেন, কামড়ে দিতে পারলে না। কসম করে বলছি, তাহলে আর কাঁদতো না ও। আরে বাবা, এসব মেয়ে আমার অনেক দেখা আছে। সতেরো বছর ধরে দেখছি।

শওকত সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। না না, তুমি মার্থাকে জানো না। ও খুব ভালো মেয়ে।

ভালো ? কথাটা বলতে গিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বুড়োটা। কোন্ ব্যাটা আছে এই শহরে, বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে আমি ভালো। সব জোচ্চোর। বদমাশ। আমার ছেলেটাকে যেদিন কুড়ি বছর ঠুকে দিলো সেদিন বুঝে ফেলেছি, চিনে ফেলেছি সবাইকে।

বাদামতলির নিষিদ্ধ এলাকায় কী একটা খুনের মামলায় জড়িত হয়ে ছেলে তার জেল খাটছে। তার কথা মনে পড়ায় সহসা কথার বল্গায় লাগাম টানলো বুড়ো। বার্ধক্যের ছানি পড়া চোখজোড়া ছলছল করছে। আকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলো সে। বাদামতলি খারাপ।

বাদামতলি খারাপ। আর তোমরা কী ? ওই তো ব্যাটা আলি খান কন্ট্রাক্টর। ফরসা জামা-কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়। বুঁইবুঁই গাড়ি হাঁকায়। আলিশান বাড়িতে থাকে। তিন–তিনটে বউ ঘরে শালার। কেউ খোঁজ রাখে ? রোজ রাতে দুই বউকে ব্যাটা বড় বড় সাহেবদের বাড়িতে ভেট পাঠিয়ে কন্ট্রাক্ট বাগায়। একটাকে রেখে দিয়েছে নিজের জন্যে। ওটা কাউকে ছুঁতে দেয় না। কেউ খোঁজ রাখে ? বলতে গিয়ে খকখক করে কিছুক্ষণ কাশলো সে। মুখে–আসা থুতুগুলো আবার গিলে নিয়ে বললো— যাকগে, তোমার একটা চাকরির দরকার বলছিলে, তাই না ?

হ্যাঁ, যাই পাও একটা জুটিয়ে দাও। যদি তোমার খোঁজে থাকে। উৎসাহে টেবিলের ওপরে ঝুঁকে এলো শওকত।

শেষ চাটুকু একঢোকে গিলে নিয়ে বুড়ো আহমদ হোসেন বললো, দিতে পারি যদি করতে রাজি থাকো। চাকরি নয়। তবে চাকরিও বলতে পারো।

কী ? শওকতের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

টুলের ওপরে একখানা পা তুলে নিয়ে উরু চুলকোতে চুলকোতে কী যেন ভাবলো বুড়ো। ভেবে বললো, কিছু না এই এদিকের মাল ওদিক করা আর কী।

তার মানে ?

শওকতের সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁত বের করে নতুন বিয়ে করা বউ-এর মতো হাসলো বুড়ো আহমদ হোসেন। শোনো, তাহলে খুলেই বলি। তোমার কাজ হবে, যেই সন্ধে হলো অমনি, কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে দেবো তোমায়, ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। তারপর কয়েকটা লোক দেখিয়ে দেবো তোমায়, প্রথম প্রথম অবশ্যই তোমার চিনে নিতে কষ্ট হবে, তারপর মাসখানেক কাজ করলেই ওদের ভাবভঙ্গি দেখে

তুমি ঠিক বের করে নিতে পারবে। এই বের করাটাই হচ্ছে আসল কাজ। তারপর, একটা কথা শিখিয়ে দেবো তোমায়, ওই কথা গিয়ে ওদের কানে কানে বলবে। ব্যস্। তারপরের কাজটা একেবারে পানির মত সহজ। কতকগুলো বাড়ি দেখিয়ে দেবো তোমায়। লোকগুলোকে সঙ্গে করে এনে সেই বাড়িগুলোতে পৌছে দিয়ে যাবে। ছানিপড়া চোখে পিটপিট করে ওর দিকে তাকিয়ে রইলো বুড়ো আহমদ হোসেন। কি, রাজি?

শওকত উসখুস করলো। কাজটা ঠিক বুঝলাম না।

বুঝবে, বুঝবে, বুঝবে না কেন। আবার একগাল হাসলো বুড়োটা। শোনো, তাহলে আরো খুলে বলি। ওই–যে বাড়িগুলোর কথা বল্লাম, ওখানে খাসাখাসা কতকগুলো মেয়ে থাকে। আহা অমন উসখুস করছো কেন, পুরোটা শুনে নাও না। তুমি নিজে তো আর কিছু করছো না, তোমার কী এলো গেলো। তুমি তো শুধু বকরা ধরে আনবে। নগদানগদি টাকা।

মেয়ের দালালি করতে বলছো আমায়? বিচিত্র ভঙ্গিতে হাসলো শওকত।

বুড়ো আহমদ হোসেন ঘোঁত করে উঠলো। এইতো এবার মুখ খারাপ করতে হয় আমার। আরে বাবা, যে–শালারা এসব কাজ করে বেড়ায় তারা লেখাপড়ায় তোমার চাইতে কম না, অনেক বেশি। নিজেকে কী অমন কেউকেটা ভাবো যে কাজটা নিতে লজ্জা করছে? আর ওই ছুঁড়িগুলো, ওরাও তোমার ওই নালা–খন্দ থেকে কুড়িয়ে আনা নয়। সব ভদ্র ঘরের মেয়ে। স্কুল–কলেজে পড়ে। ঘর–সংসার করে। ইচ্ছে করলে কোনোদিন তুমি নিজেও গিয়ে দু–এক রাত শুয়ে আসতে পারো ওদের সঙ্গে। তোমার কী? টাকা রোজগার হলেই হলো। ওরাও তো টাকার জন্যেই করছে এসব।

চলি এবার। এই অস্বস্তিকর প্রস্তাবের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে শওকতের। সে উঠে দাঁড়ালো।

ব্যস্। পছন্দ হলো না তো। বুড়ো আহমদ হোসেন শুয়োরের মতো ঘোঁতঘোঁত করে বললো, তা পছন্দ হবে কেন। যাও মার্থার কাছেই যাও, গিয়ে মার্থার ঠোঁট চোষো গিয়ে, তাতেই পেট ভরবে। আমার কাছে এসে আর পেনপেন কোরো না। ঘুষি মেরে একদম নাকের ডগা গুঁড়ো করে দেবো।

শেষের কথাগুলো শওকতের কানে গেলো না। ততক্ষণ রাস্তায় নেমে গেছে সে। মার্থার কাছেই যাবে সে। হ্যাঁ, মার্থার কাছে।

মার্থা ওকে ঘৃণা করবে। করুক। ওর কাছে মাফ চাইবে সে। বলবে, আমাকে ক্ষমা করে দাও মার্থা। আমি না-বুঝে অন্যায় করে ফেলেছি। তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। সারাটা জীবন আমি দেশের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছি। এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজ নিয়েছি। কোথাও শান্তি পাইনি। আমি তোমার কাছে শুধু একটু শান্তি পেতে গিয়েছিলাম। আর কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। মার্থা, তুমি কেন আমাকে কাছে টেনে নিলে না মার্থা।

মার্থা কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। ক্রেতাদের সঙ্গে সেই আগের মতো হেসে-হেসে কথা বলছে সে। তেমনি সহজ। স্বাভাবিক।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখলো শওকত। বিকেলে আসতে বলেছিলো সে। এখন রাত। যে–লোকটার আসার কথা ছিলো সে বোধহয় এসে চলে গেছে। ভেতরে যাবে কিনা ভাবলো। ভাবতে গিয়ে কাল রাতের কথা আবার মনে হলো ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ের রাক্ষস এসে গ্রাস করতে চাইলো ওকে। পা কাঁপলো। মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। বুকটা ধুকধুক করছে।

মার্থা কাউন্টার ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। শওকতের মনে হলো এখনি একটা দৌড় দিয়ে পালাতে পারলে বেঁচে যায় সে। কিন্তু, মার্থা সোজা ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। কী ব্যাপার, ভেতরে না গিয়ে এতক্ষণ ধরে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন। চলো। মার্থার গলার স্বর আর মুখের ভাব-ভঙ্গি দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলো শওকত। ভেতরে যেতে যেতে মার্থা আবার বললো, এত দেরি করে এলে কেন, ভদ্রলোক তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেছেন। বসো এখানে। ওকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে আবার কাউন্টারে চলে গেলা মার্থা।

রাতকানা লোকটা চশমার ফাঁকে বারকয়েক তাকালো ওর দিকে। কেমন যেন একটা সন্দেহের দৃষ্টি। যেন শওকত একটা মস্তবড় অন্যায় করে ফেলেছে। মার্থা ওই রাতকানা লোকটাকে সব কথা বলে দেয়নি তো ? নইলে লোকটা গোঁফের নিচে অল্পঅল্প করে হাসছে আর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কেন ওকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ?

এসো। কতক্ষণ পরে মনে নেই, মার্থা এসে ডাকলো ওকে। ওর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলো শওকত। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, মার্থা আজ সেজেছে। বিয়ের আগে সেই বেকারীতে আসার সময় যেমন সাজতো সে, তেমনি। হঠাৎ যেন বয়সটা অনেক কমে গেছে ওর।

রাস্তায় নেমে কিছুদূর পথ কোনো কথা বললো না মার্থা। ওকে বেশ গম্ভীর মনে হলো। শওকত ভাবলো, আর দেরি না করে এই পথচলার ফাঁকে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে হয়।

মার্থা অকস্মাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। বললো, তোমার চাকরিটা বোধহয় হবে না।

হবে না ? ওর কথাটারই যেন প্রতিধ্বনি করলো শওকত।

মার্থা বললো, হোতো। এখনো হয়। ওর কথায় যদি আমি রাজি হয়ে যাই।

কে জানে হয়তো মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে সব জায়গায় এমনি আদর-সোহাগ পাওয়া যায়। শওকত ভাবলো।

কী কথা ? শওকতের দম বন্ধ হয়ে এলো।

মার্থা বললো, থাক, নাইবা শুনলে।

শওকত শুনে ছাড়বে। বললো, বলোই না।

মার্থা বললো, লোকটা আমাকে দিন কয়েকের জন্যে ওর সঙ্গে কক্সবাজার বেড়াতে যেতে বলছিলো।

কেন ?

মার্থা ম্লান হাসলো। তোমাকে চাকরি দেয়ার জন্যে।

ততক্ষণে একটা সেলুনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। শওকত বললো, এখানে কী ?

মার্থা ওর মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, মুখের দাড়িগুলো কত লম্বা হয়ে গেছে। একবার আয়নায় গিয়ে দেখো। চলো, শেভ করে নাও।

এখন, এই রাতে ?

হ্যাঁ এখন, যাও ঢোকো। মার্থার চোখেমুখে শাসনের ভঙ্গি। ভালোই লাগলো শওকতের, কাল রাতের কথা হয়তো ভুলে গেছে মার্থা। খোদা, ওকে সব ভুলিয়ে দাও।

সেলুনের লোকগুলো টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখছে মার্থাকে। হাতজোড়া কোলে নিয়ে মার্থা এককোণে চুপচাপ বসে। যে-লোকটা ওর মুখে সাবান ঘষছে তার যেন কোনো তাড়া

নেই। অফুরন্ত অবসর। অথচ এর আগে যখন সেলুনে দাড়ি কামাতে এসেছে সে, তখন লোকগুলো এত তাড়াহুড়ো করেছে যে, অর্ধেকটা দাড়ি থেকে গেছে মুখে। ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে পাওনা চুকিয়ে দিলো মার্থা। তারপর আবার রাস্তায় নেমে এলো ওরা।

মার্থা বললো, আজ আর বাসায় ফিরে গিয়ে রান্নাবান্না করতে পারবো না। চলো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নেবো। মার্থার গলায়, কথায়, অভিব্যক্তিতে সামান্য জড়তা নেই। অথচ কাল রাতে বালিশে মুখ গুঁজে মেয়েটা কেমন ডুকরে কাঁদছিলো। শওকতের মাথায় আবার সবকিছু তালগোল পাকাতে শুরু করেছে। একটা জট খুলতে গিয়ে সহস্র জটে জড়িয়ে যাচ্ছে চিন্তার সুতোগুলো।

রেস্টুরেন্টের একটা কোণ বেছে পাখার নিচে গিয়ে বসলো ওরা।

মার্থা শুধালো, কী খাবে বলো।

শওকত শুধালো, তুমি কী খাবে বলো।

মার্থা বললো, আমি শুধু এক কাপ চা খাবো। আমার ক্ষিদে নেই।

বারে আমি একা খাবো।

হ্যাঁ। তুমি খাবে আর আমি বসে-বসে তোমার খাওয়া দেখবো। এতক্ষণে একটুকরো হাসি ঝিলিক দিয়ে গেলো ওর মুখে। কী খাবে বলো।

কাবাব-পরটা।

অর্ডার দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেলো। মার্থা তার কথামতো বসে-বসে ওর খাওয়া দেখলো। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বললো সে। বললো, সকালে অমন মোষের মতো ঘুমুচ্ছিলে কেন? দরজায় কত ধাক্কা দিলাম, জাগলে না। দুপুরে নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়া হয়নি। নাহ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না আমি। দ্যাখো তো শেভ করে নেয়ায় তোমাকে এখন কত ভালো দেখাচ্ছে। কী রকম বিশ্রী আর রোগা রোগা লাগছিলো। বললো, পরটা রেখে দিলে কেন, খেয়ে নাও। আরেকটা কাবাব আনতে বলবো?

কাল রাতের একটু চিহ্নও নেই মার্থার চোখেমুখে। তবু রিকশায় উঠে শওকত ভাবলো মার্থার কাছ থেকে এইফাঁকে ক্ষমা চেয়ে নিতে হয়।

শওকত ডাকলো, মার্থা।

মার্থা বললো, কী।

শওকত ঢোক গিললো। একটা কথা বলবো?

বলো।

তুমি নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করেছো তাই না?

কেন। রাগ করবো কেন? মুখ ঘুরিয়ে শওকতের দিকে তাকালো সে। পরক্ষণে যেন রাগ করার কারণটা মনে পড়ে গেলো ওর। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কেমন কালো হয়ে এলো মার্থার।

শওকত লক্ষ করলো।

মার্থা বললো, ওহ। বলে চুপ করে রইলো সে।

অন্ধকার গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে রিকশাটা। দুজনে নীরব। কী অসহ্য এই নীরবতা। শওকতের মনে হলো এখনি ভেঙে পড়বে সে। মার্থা ধীরেধীরে বললো, সত্যি এটা তোমার কাছ থেকে আশা করিনি।

শওকত মরিয়া হয়ে বললো, মার্থা, আমাকে মাফ করে দাও তুমি, তুমি যা ভাবছো আমি তা নই। বিশ্বাস করো।

ওর একখানা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলো মার্থা। মৃদু হেসে বললো, পাগল। তুমি একটা আস্ত পাগল। যে-জিনিসটা চাইলেই পেতে, তাকে অমন চোরের মতো পেতে চাও কেন ? জানো, কাল রাতে আমার মনে হয়েছিলো তুমিও আর পাঁচটা লোকের মতো। নিতান্ত সাধারণ। তোমার চোখজোড়া কী বিশ্রী লাগছিলো, মনে হচ্ছিলো একটা মাতাল। গুণ্ডা। ছোটলোক। সত্যি, তোমার ওপরে হঠাৎ ভীষণ ঘেন্না এসে গিয়েছিলো আমার। আমি সেটা সহ্য করতে পারিনি, তাই কেঁদেছিলাম। ওর হাতখানা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরলো মার্থা।

শওকত একটা সুবোধ বালকের মতো বললো, আর আমি অমন করবো না মার্থা।

মার্থা হাসলো। পাগল।

রিকশাটা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে। পুরো পাড়াটা ঝিমুচ্ছে ঘুমের ঘোরে।

শওকত আস্তে করে ডাকলো, মার্থা।

মার্থা ওর হাতটা কোলের কাছে টেনে এনে বললো, বলো।

শওকত ইতস্তত করলো। এখন একটা চুমো দিই।

না।

কেন ?

রিকশাওয়ালাটা কি মানুষ না নাকি ? মার্থা ফিসফিস করে বললো, ঘরে গিয়ে দিয়ো। যত ইচ্ছে দিয়ো।

রিকশা থেকে নামলো ওরা।

কুষ্ঠরোগীটা রকের ওপর বসে। আজ ওর প্রতি হঠাৎ বড় মায়া হলো শওকতের। মার্থার দিকে চেয়ে বললো, লোকটাকে একদিন হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয়। এখনো ঠিকমতো চিকিৎসে করলে হয়তো ভালো হয়ে যাবে। কী বলো ?

কিন্তু মার্থা ওর কথার কোনো জবাব দিলো না। রিকশার পয়সাটা চুকিয়ে দিয়ে আস্তে করে বললো, এসো।

অন্ধকার করিডোরে দাঁড়িয়ে মার্থা আবার বললো, ম্যাচিশটা জ্বালাও তো। তালা খুলি।

পকেট থেকে দিয়াশলাই-এর বাক্সটা বের করে জ্বালালো শওকত। খুট করে একটা শব্দ হলো পেছনে। শওকত ফিরে তাকালো। পেছনে দরজার আড়ালে একটা ছায়া। কাঁচা হলুদের মতো যার গায়ের রঙ। তামাটে যার চোখ। আর গাঢ় বাদামি যার অধর। শওকতের মাথাটা আবার ঝিমঝিম করে উঠলো। একটা ভয়ের রাক্ষস এসে ধীরেধীরে গ্রাস করছে ওকে।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো মার্থা। মিষ্টি গলায় ডাকলো, এসো।

না। এখন না। মার্থা। শওকত ঢোক গিললো। তারপর আর একমুহূর্তও সেখানে দাঁড়ালো না সে। মার্থা অবাক হয়ে দেখলো অন্ধকার সিঁড়ির মোড়ে হারিয়ে গেলো শওকত।

ভয়ের রাক্ষস তাড়া করছে ওকে।

॥ বার ॥

সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে আড়াল-রাখা একজোড়া উদ্ধত যৌবন, নিচে তার ঘরে নাচের মহড়া দিচ্ছে। এখান থেকে তার ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে শওকত।

মার্থা বললো, দেরি করছো কেন, ওঠো। তাড়াতাড়ি বাড়িটা দেখে আসি গিয়ে। আমাকে আবার দুটোর মধ্যে দোকানে যেতে হবে। এ বেলা ছুটি নিয়েছি। শওকতের

শুকনো চুলের দিকে চোখ পড়তে বললো, মাথায় তেল দাও। ভালো করে চুলগুলো আঁচড়ে নাও। এমন ছন্নছাড়ার মতো থাকো!

না। আর এই ছন্নছাড়া জীবন নয়। এবার নিজেকে গুছিয়ে নিতে চায় শওকত। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়েছে। জীবনের সহস্র সর্পিল পথের বাঁকে থেমেছে। দেখেছে। ঘুরেছে অনেক। আজ বড় ক্লান্ত সে।

ওরা অনেক টাকা ভাড়া চাইবে। শওকত ধীরেধীরে বললো, কমপক্ষে দেড়শ' টাকা।

মার্থা বললো, চলো না, একবার গিয়ে দেখি তো।

গত কয়েকদিন ধরে অনেক বাড়ি দেখেছে ওরা। অনেক অলিগলি ঘুরেছে। বাড়ি পছন্দ হলেও ভাড়ার অঙ্ক শুনে চুপসে গেছে মন।

বাবুবাজারের বাড়িটা পেলে মন্দ হতো না। শওকত চুলে তেল দিতে-দিতে বললো। ভাড়াটাও কম ছিলো।

কিন্তু অত টাকা আগাম দেবে কোত্থেকে? ওর দিকে চিরুনিটা বাড়িয়ে দিলো মার্থা। আমাদের তো আর একগাদা জমা-টাকা নেই। কথাটা বলে ম্লান হাসলো সে। তাছাড়া বাড়ি ভাড়াতে সব টাকা খরচ হয়ে গেলে, খাওয়া-পরা চলবে কেমন করে। পরের কথাটা বলতে গিয়ে থামলো মার্থা। লজ্জায় মুখখানা রাঙা হলো ওর। আস্তে করে বললো, বিয়ের পর সংসারটা তো আর অমন ছোট থাকবে না। বাড়বে। বলে রাঙা মুখখানা অন্য দিকে সরিয়ে নিল সে।

শওকত মনে-মনে হিসেব করে দেখলো, সত্যিই তো। মাসে দেড়শ' টাকা করে পায় মার্থা। একশ' টাকা বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে আর থাকে কত। ভাবতে গিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে হলো ওর। ও যদি একটা চাকরি পেতো।

আচ্ছা মার্থা, ও লোকটা তোমাকে কক্সবাজার নিয়ে যেতে চায় কেন?

কোন্ লোকটা।

ওই যে, যাকে আমার চাকরির কথা বলেছিলে।

ও, মার্থা সহসা গম্ভীর হয়ে গেলো। একটু পরে ম্লান হেসে বললো, কেন নিয়ে যেতে বোঝ না?

ওর চোখের দিকে চোখ পড়তে শওকত আর কোনো কথা বলতে পারলো না। মুখখানা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেলো ওর।

মার্থা সেটা লক্ষ করে বললো, এতসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়ো না তো। যা হবার হবে। চলো। চারপাশে সন্তর্পণে তাকিয়ে ওর খুব কাছে এগিয়ে এসে মুহূর্তে ওকে একটু আদর করে নিয়ে আবার বললো, চলো।

শওকত বললো, যাই বলো বিয়ের পরে কিন্তু এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

মার্থা বললো, ঠিক আছে। আমি তো অমত করিনি। তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি যাবো। আপাতত একটা বাড়ি খুঁজে তো বের করি। চলো।

সেলিনার ঘরের দরজাটা খোলা। ভেতরে এখনো নাচের মহড়া দিচ্ছে সে। কাঁচা হলুদ মাংস বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরছে ওর। নানা রঙের বুটি-আঁকা অপরিসর কামিজের নিচে যৌবনের ভাজগুলো থরেথরে সাজানো। তাকাবে-না তাকাবে-না করেও একবার তাকাতে হলো। তাড়াতাড়ি চোখজোড়া ফিরিয়ে নিলো সে। না, ওকে আর ভয় করবে না শওকত। মার্থা রয়েছে সঙ্গে। নতুন বাড়িতে গিয়ে মার্থাকে নিয়ে নতুন জীবনের ভিত পাতবে সে। না, আর ভয় করবে না।

ওরা রিকশা নিলো না। হেঁটে চললো।

মার্থা বললো, এই তো অল্প একটু পথ।

শওকত তার কথা শেষ করলো। হেঁটেই যাওয়া যাবে। শওকত জানে, কদিন থেকে বেশ হিসেবি হয়ে উঠেছে মার্থা। আটআনা পয়সা বাঁচতে পারলে মন্দ কী। কাজে আসবে।

এ পথে উদ্দেশ্যবিহীন বহু হেঁটেছে শওকত। মার্থাকে নিয়ে আজকের এই হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে তাদের কোনো মিল নেই। এই শহরে কত লোক। কত বাড়ি। তারই এককোণে একটা বাসার খোঁজে বেরিয়েছে ওরা। মার্থা আর শওকত।

শওকত আর মার্থা। একটা পছন্দমতো ঘর। কিছু আশা। কিছু স্বপ্ন। অনেক ভালোবাসা। আর হয়তো অশেষ দৈন্যে-ভরা একটুকরো সংসার। তাই হোক।

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা লম্বা মিছিল যাচ্ছে। ছাত্ররা স্ট্রাইক করেছে। গলা উঁচিয়ে চিৎকার করে শ্লোগান দিচ্ছে ওরা। হাতে হাতে অসংখ্য ফ্যাস্টুন। প্লাকার্ড। মিছিলটা বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত থামলো না।

মার্থা আস্তে করে শুধালো, কী ভাবছো।

শওকত বললো, কিছু না।

মার্থা বললো, আমি কী ভাবছি বল তো।

শওকত চিন্তা করে নিয়ে বললো, তুমি। তুমি ভাবছো একটা বাড়ির কথা।

না। মোটেই না, মৃদু হেসে মাথা নাড়লো মার্থা। আমি ভাবছি বাড়িটা পেলে কেমন করে সাজাবো তাই।

শওকত তাকিয়ে দেখলো মার্থার চোখে স্বপ্ন। আজকাল আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর লাগে ওকে।

বাড়ি দেখে দুজনেই পছন্দ হলো। হোক না কবুতরের খোপের মত ছোট-ছোট দুটো কামরা। তবু ভাড়া কম। মাসে পঁচাত্তর টাকা।

দু-মাসের আগাম দিতে হবে, দেড়শ'। সে টাকা দিয়ে বাড়ির ভেতরটা মেরামত আর চুনকাম করে দেবে বাড়িওয়ালা। এঘর ওঘর ঘুরে-ঘুরে দেখলো মার্থা। পেছনে ছোট একটুকরো উঠোন। সরু বারান্দা। রান্নাঘরে এসে ঢুকলো মার্থা। উপরের টিনগুলো ফুটো হয়ে গেছে। এদিকে ওদিকে তাকাতে দেখে বাড়িওয়ালা বললো, ওর জন্যে ঘাবড়াবেন না। আগমা পেলে সব মেরামত করে দেবো। আগে যারা ছিলো—এক নম্বরের পাজি লোক, ভাড়ার টাকা নিয়ে খিটিমিটি করতো। তাই আমিও আর মেরামতে হাত দেইনি। আপনাদের জন্যে সব দেবো আমি। একটু অসুবিধেও হতে দেবো না, দেখবেন।

শওকতের দিকে তাকালো মার্থা।

শওকত বললো, ভালোই তো লাগছে।

বাড়িওয়ালা বললো, আপনারা দেখুন। দোকানটা খালি ফেলে এসেছি। চলি। যাবার সময় দেখা করে যাবেন।

শওকত ঘাড় নাড়লো। বাড়িওয়ালা চলে গেলে মার্থা বললো, লোকটা বেশ।

শওকত বললো, হুঁ।

মার্থা বললো, আমাদের আর দেখার কী আছে।

শওকত বললো, চলো।

আগে চোখে পড়েনি। সরু পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলো বাসার সামনে একটা ছোট স্টেশনারি দোকান আছে বাড়িওয়ালার। দোকানঘরটাও বাড়িরই একটা অংশ। মাঝখানে একটা দরজা আছে ভেতরে যাওয়ার। এখন সেটা বন্ধ। বাড়িওয়ালা বললো, কেমন দেখলেন।

শওকত বললো, ভালো।

মার্থা তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোকানঘরটাকে লক্ষ করছিলো। সহসা বললো, এটা আপনার নিজের বুঝি ?

বাড়িওয়ালা একগাল হাসলো। হ্যাঁ। তারপর বললো, ঠিকমতো দেখাশোনা করতে পারি না। নানা ঝামেলা। ভালো খদ্দের পেলে ভাবছি বিক্রি করে দেবো।

মার্থা তাকালো শওকতের দিকে।

শওকত বললো, চলো।

বাড়িওয়ালা বললো, তাহলে বাড়ি আপনারা ভাড়া নিচ্ছেন। পাকা কথা, কী বলেন ?

মার্থা বললো, দোকানটা সত্যিসত্যি বিক্রি করবেন নাকি ?

বাড়িওয়ালা একটু অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। অস্পষ্ট স্বরে বললো, হ্যাঁ।

মার্থা বললো, কত দিয়ে বেচবেন ?

শওকত ঠিক বুঝতে পারলো না কী চায় মার্থা।

বাড়িওয়ালা বললো, তা, হাজার তিনেক তো বটে।

টাকা অঙ্কটা মনে-মনে একবার উচ্চারণ করলো মার্থা।

ঠোঁট নাড়লো। কোনো শব্দ বেরুলো না।

শওকত বললো, চলি।

মার্থা বললো, কাল আবার আসবো।

বাড়িওয়ালা একগাল হেসে বিদায় দিলো ওদের।

আশ্চর্য ! কী লাগামহীন স্বপ্ন দেখতে পারে মানুষ। দু-মাসের আগাম ভাড়া দেড়শ' টাকা হাতে নেই। তিনহাজার টাকা দিয়ে দোকান কেনার জন্যে উতলা হয়ে পড়েছে মার্থা।

শওকত বললো, স্রেফ পাগলামো।

মার্থা বললো, হোক পাগলামো। তবু সুন্দর। একবার চিন্তা করে দ্যাখো না। দোকনটা পেলে আর কোনো ঝামেলাই থাকবে না আমাদের। আমি কাউন্টারে বসে দোকান চালাবো। তুমি বাইরে থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে দেবে। হিসেবটা দেখবে। কী চমৎকার হবে তাই না ?

যতসব বাজে চিন্তা। শওকত বিড়বিড় করলো। কিন্তু মার্থার প্রস্তাবটা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলো না। নিজের মনকে একটু যাচাই করতে গিয়ে দেখলো, মার্থা মন্দ বলেনি। দোকানটা যদি কিনতে পারে ওরা, তাহলে আর অন্যের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটাতে হবে না ওদের। কিন্তু, একসঙ্গে অতগুলো টাকা।

মার্থা বললো, আহ্, টাকার কথাটা তুলে এ সুন্দর স্বপ্নটাকে মাটি করে দিয়ো নাতো। ধরে নাও, টাকাটা আমরা পেলাম। সে যেখান থেকেই পাই। চুরি করে হোক, ডাকাতি করে হোক। সে পরে দেখা যাবে'খন। ধরো না, দোকনটা আমরা কিনেছি। তুমি-আমি পেছনের ঘর দুটোতে থাকি। আর সারারাত বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি, কেমন করে কেমন

করে দোকানটা আরো সাজাবো, আরো বড়ো করে তুলবো। ওকে আমাদের কোলের ছেলের মতো, বলতে গিয়ে সহসা হেসে উঠলো মার্থা। হাসির গমকে সমস্ত দেহটা দুলে উঠলো ওর। চোখের কোণে জেগে উঠলো একজোড়া তরল মুক্তো।

শওকত অবাক হয়ে বললো, হঠাৎ কান্না।

মার্থা ওর কথার মাঝখানে বললো, কুটো পড়েছে। তারপর দু-হাতের তালু দিয়ে চোখজোড়া ভীষণভাবে রগড়াতে লাগলো সে। রুমালে ফুঁ দিয়ে দু-চোখে গরম তাপ দিলো।

শওকত বললো, অযথা চোখ দুটো লাল করছো কেন ?

মার্থা মৃদু হেসে রুমালটা সরিয়ে নিলো। সোজা ওর দিকে তাকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে বললো, দোকানটা কিন্তু কিনতেই হবে কী বলো ?

কেনার মতো টাকা নেই আমাদের। সংক্ষেপে জবাব দিলো শওকত।

মার্থা আগের মতো হেসে বললো, দুনিয়াতে কেউ টাকা নিয়ে জন্মে না।

শওকত প্রতিবাদের স্বরে বললো, জন্মে কী ! বড়লোকের ঘরের ছেলেমেয়েরা।

আর যাদের বাপ-মা বড়লোক ছিলো না। তারা ? মার্থার দৃষ্টি শওকতের মুখের দিকে।

ওরা নিজেরা খেটে রোজগার করে।

কী দিয়ে ?

বিদ্যা বুদ্ধি আর শ্রম দিয়ে।

আমরাও তাই করবো। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগলো মার্থা। ওর চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি। যেন এ-মুহূর্তে তিনহাজার টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেছে সে। হাতজোড়া বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে রেখে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। জুতোর গোড়ালি-জোড়া-জোরে জোরে মাটিতে ঠুকলো। কী যেন ভাবলো। তিনহাজার টাকা। মাত্র তিনটে হাজার টাকা রোজগার করতে পারবো না আমরা ? ঘুরে দাঁড়িয়ে শওকতের দিকে এগিয়ে এলো মার্থা।

আজ সকালে যারা দেড়শ' টাকার চিন্তা করতে গিয়ে বিব্রতবোধ করছিলো, এখন-তারা তিনহাজার টাকা সমস্যার কথা ভেবে মনে-মনে হয়রান হচ্ছে।

মার্থা পাগল। কিন্তু শওকত নিজেও জানে না, কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে সে নিজেও সেই পাগলামোর জালে জড়িয়ে পড়েছে।

সে ভাবছে বুড়ো আহমদ হোসেনের কথা।

অন্ধকারে যে একটুকরো আলোর ছটা।

কী হবে যদি ওর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায় শওকত। জীবনভর তো আর কোনো কাজ করবে না সে। যতদিন তিনহাজার টাকা যোগাড় না হয় ততদিন। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে মার্থাকে নিয়ে সংসার পাতবে সে।

মার্থা তখনো অনর্গল বকে চলেছে। রাতকানা লোকটা সারাদিন খাটিয়ে মারে। তবু তার কতরকম ধমক শুনতে হয় । জাহান্নামে যাক সে। আর ওখানে কাজ করবো না আমি। নিজের দোকান, নিজের সব।

শওকত সহসা বললো, ঘাবড়িয়ো না মার্থা, টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

কেমন করে ? আচমকা থমকে দাঁড়ালো মার্থা। চোখজোড়া বড় করে তাকালো ওর দিকে।

শওকত বললো, আমরা দিনরাত খাটবো।

ওর মসৃণ চুলগুলোর মধ্যে হাত বুলিয়ে দিয়ে ম্লান হাসলো মার্থা। থেপেছো। একটু আগের মার্থাকে যেন এখন চেনাই যায় না। উতলা মনের নিচে এত গভীর একটা খাদ লুকোনো ছিলো তা কে জানতো। মার্থা ধীরেধীরে বললো। ওসব পাগলামো থাক। শোনো, অনেক রাত হয়ে গেছে। যাও এবার ঘুমোও গিয়ে।

শওকত অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো মার্থার দিকে। তারপর বললো, কাল থেকে আমি একটা চাকরিতে জয়েন করছি মার্থা।

তাই নাকি ? আগে বলোনি তো। মার্থার চোখেমুখে আনন্দের আভা। শওকত সেটা লক্ষ করে বললো, বুড়ো আহমদ হোসেন জোগাড় করে দিয়েছে।

কোথায় ?

সেটা এখনো জানি না। কাল রাতে জানবো।

সত্যি বলছো ; চোখের মণিজোড়া হাসিতে চিকচিক করছে মার্থার।

শওকত ঢোক গিলে বললো, সত্যি।

একটা পুরানো টিনের কৌটো থেকে অতি যত্ন করে রাখা কতকগুলো নোট বের করে আনলো মার্থা। শওকতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, গুণে দ্যাখো তো কত।

শওকত অবাক হয়ে বললো, এগুলো কোথায় পেয়েছো।

কেউ নিশ্চয়ই দান করেনি, মার্থা শান্তগলায় বললো। এতদিন ধরে চাকরি করছি। দু-চারটা টাকা জমাতে পারিনে বুঝি। মার্থার কণ্ঠে কৈফিয়তের সুর।

নোটগুলো গুণতে গিয়ে শওকত বললো, দেখে তো পুরানো মনে হয় না। মনে হচ্ছে একেবারে কড়কড়ে নতুন।

মার্থা সঙ্গে সঙ্গে বললো, কী যে বলো। দাও, তোমাকে দিয়ে গোনা হবে না। আমি গুনছি। ওর হাত থেকে ওগুলো কেড়ে নিয়ে গুনলো মার্থা, পঁচিশ টাকা।

আর পঁচিশ টাকা হলে বাড়ি ভাড়ার আগামটা হয়ে যায়। শওকত বললো।

মার্থা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। না না, আগে দোকান, তারপর বাড়ি ভাড়া নেবো।

শওকত কোনো উত্তর দেবার আগের মার্থা আবার বললো, তিনহাজার টাকার আর কত বাকি থাকে ?

শওকত মনে-মনে হিসেব করে বললো, আটাশশ' পঁচাত্তর টাকা। বলে হেসে উঠলো সে।

নোটগুলো আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে মার্থা বললো, বোসো, আমি হাতমুখ ধুয়েনি।

আলনা থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মুখহাত ধুতে গেলো মার্থা। দুহাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলো শওকত। রোজ যাবে যাবে করেও আজ পর্যন্ত বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে যাওয়া হয়ে উঠলো না। অথচ মার্থার কাছে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলেছে সে। বলেছে ও চাকরি করছে। কাজ চলছে ওর।

অফিস কোথায় তোমার ? মার্থা প্রশ্ন করেছে। শওকত বিব্রতকণ্ঠে বলেছে। এ চাকরিতে কোনো অফিস নেই ; রাস্তায় রাস্তায় কাজ।

কাজটা কী ? মার্থা শুধিয়েছে আবার।

শওকত বলেছে—কাজটা, মানে ওটা হচ্ছে তোমার, একজায়গার জিনিসপত্র আরেক জায়গায় আনা-নেয়া করা। মানে ওই-যে কী বলে ফ্লাইং বিজনেস। ও-রকমই অনেকটা।

ও। মার্থা থামেনি। আরো প্রশ্ন করেছে। বেতন কত দেবে কিছু ঠিক হয়নি ?

না। তবে বলেছে দু-চার দিনের মধ্যে জানাবে।

আগাগোড়া সবটাই মিথ্যে। কেন এ মিথ্যের হাতে নিজেকে এভাবে সমর্পণ করলো ভেবে পায় না শওকত। কোনো প্রয়োজন ছিলো না। ও চাকরি করছে না, শুনলে নিশ্চয় ওর ওপরে রাগ করতো না মার্থা। তবু আসলে বুড়ো আহমদ হোসেনের কাছে যেতে ভয় হয় শওকতের। একটা অজানা ভয়ে শিরদাঁড়া শিরশির করে ওঠে। ওর মনে হয় ওই আলেয়ার জালে নিজেকে একবার জড়ালে জীবনভর হয়তো আর ছাড়া পাবে না।

মার্থা কাল বলেছিলো। ধরো তুমি যা ভাবছো তারচে' অনেক বেশি টাকা বেতন পেয়ে গেলে তুমি। তখন কী করবে? না, হাসি নয়। ধরোই না ছাই। কী বাধা আছে চিন্তা করতে। ওরাতো এখনো টাকার অঙ্ক বলেনি। ধরো অনেক টাকা বেতন পেলে তুমি। কী করবে তখন।

খুব কম করে খরচ করবো আর বাকিটা জমাবো।

শুনে মার্থার চোখজোড়া ঝলমল করে উঠেছে। জানো, আমিও তাই ভাবছিলাম।

এ কদিন শওকত কম ভাবেনি। নানারকম উদ্ভট চিন্তায় ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছে। যদি এমন হতো হয়তো কোনো বড়লোক আত্মীয় মারা গেছে। আর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছে তাকে। না। হিসেব করে দেখা গেলো তেমন কোনো আত্মীয়-অস্তিত্ব কল্পনায় ছাড়া বাস্তবে নেই। এমন তো হতে পারতো যে হঠাৎ একটা লটারী জিতে গেছে শওকত। না। সে সম্ভবনাও আপাতত নেই। মাত্র তিনহাজার টাকা। দুনিয়াতে এত টাকা অথচ পাবার কোনো উপায় নেই।

না, কথাটা সত্য নয়। বুড়ো আহমদ বলেছিলো, তোমরা হলে সব এক-একটা উল্লুক। নইলে টাকা রোজগারের জন্যে চিন্তে করতে হয়। টাকা তো সব কাদার নিচে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কাদা ঘাঁটো। টাকা পাবে। কাদায়ও হাত দিবে না, টাকাও রোজগার করবে, সে তো চলবে না বাছা।

না, এবার কাদায় নামবে শওকত। প্রয়োজন হলে সবটুকু নর্দমাই হাতড়ে বেড়াবে সে। তিনহাজার টাকা। তারপর।

মার্থা ততক্ষণে হাতমুখ ধুয়ে এসে বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে। চেহারায় একটু পাউডারের প্রলেপ বুলিয়ে নিয়ে মার্থা বললো, চলো।

চারপাশের দিকে আজকাল আর নজর পড়ে না শওকতের। কেউ জুয়ার আড্ডায় বসেছে কি বসেনি, কেউ গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে কি করছে না, সেদিকে তাকায় না শওকত। ওসব যেন অর্থহীন হয়ে গেছে তার কাছে। হারুনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর জাহানারার দিন কেমন করে কাটছে। সেই মাতাল কেরানিটা এখও কি রোজ রাতে তার বউকে মারছে। সে সবের খোঁজ নেয় না সে। যতক্ষণ কিছু ভাবে, ভাবে তিনহাজার টাকার কথা। যতক্ষণ কথা বলে, বলে মার্থার সঙ্গে। পৃথিবী যেন হঠাৎ অনেক ছোট হয়ে গেছে। চিন্তার ধারাগুলো আর বিক্ষিপ্ত নয়, যেন একটা বিন্দুর চারপাশে সারাক্ষণ অস্থিরভাবে ঘুরে মরছে। একটা ঘর। একটা দোকান। একটা সংসার। আর তার জন্যে মাত্র তিনহাজার টাকা।

হাতে একটা থলে নিয়ে বেরিয়ে এলো মার্থা।

শওকত বললো, ওটা দিয়ে কী হবে।

মার্থা বললো, কাজ আছে। শোনো, আজ রাতে ফিরতে দেরী হবে আমার।

কেন? শওকত অবাক হয়ে তাকালো।

মার্থা ইতস্তত করে বললো, রাতকানা লোকটা বলেছে দোকান বন্ধ হবার পর কিছু হিসেবপত্র করতে হবে। তাই। শওকত চুপ করে রইলো। কিছু বললো না।

মার্থা মুখ ঘুরিয়ে তাকালো ওর দিকে। মৃদু হেসে বললো, তুমি কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ো না যেন। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি আসতে চেষ্টা করবো।

শওকত বললো, আমারো অবশ্য আজ একটু রাত হবে। ওরা বলছিলো রাতেও কাজ করতে।

রাতে কেন?

তাহলে বাড়তি কিছু টাকা দেবে। টাকার কথা শুনে মার্থা আর কোনো প্রশ্ন করলো না। শুধু একবার হাতের থলেটার দিকে তাকালো।

॥ তেরো ॥

পর পর কয়েকদিন বুড়ো আহমদ হোসেনের আখড়ার কাছে এসে ফিরে গেলো শওকত। সারাপথ মনটাকে ধরে রাখলেও বুড়ো আহমদ হোসেনের নজরের সীমানার আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সত্তা যেন বিদ্রোহ করে উঠে ওর।

মার্থা বলে। তোমার কী হয়েছে বলো তো। দিন দিন অমন শুকিয়ে যাচ্ছো কেন।

শওকত সংক্ষেপে উত্তর করে। কাজের চাপে।

মার্থা মমতার স্বরে বলে। থাক, ও কাজে দরকার নেই। ওটা ছেড়ে দাও। কাজ করে শেষে মরবে নাকি?

শওকত ম্লান হাসে। মার্থা যদি জানতো!

অথচ মার্থা নিজেও খাটছে দিনরাত। আজকাল বাসায় ফিরতে ওরও অনেক রাত হয়ে যায়। তখন বড় ক্লান্ত দেখায় ওকে।

শওকত প্রশ্ন করে। কী ব্যাপার। তুমিও কি কোনো বাড়তি কাজ নিয়েছো নাকি?

না অমন কিছু নয়। মার্থা মৃদু হেসে বলে। রাতকানা লোকটার হিসেব দেখে দিই। সে জন্যে আলাদা করে মাসে মাসে কিছু টাকা দেবে বলেছে। শোনো, হঠাৎ প্রসঙ্গটা পালটে দেয় মার্থা। এক ভদ্রলোক বলেছিলো, ধারে কিছু টাকা জোগাড় করে দেবে। নেবো?

ভদ্রলোকটি কে?

তুমি চিনবে না। মার্থা হেসে বলেছে। অবশ্য বলছিলো, মাসে মাসে সুদ দিতে হবে।

থাক। সুদে টাকা ধার নেবার দরকার নেই। শওকত বিমর্ষ গলায় বলেছে। শেষে সুদের টাকা জোগাতে গিয়ে মরবে।

ঠিক আছে নেবো না। মার্থা আবার প্রসঙ্গটা পালটে দিয়ে বলেছে। জানো, কাল রাতে দোকানটা আবার গিয়ে দেখে আসছি আমি। বাড়িওয়ালা বলছিলো, ভালো করে চালাতে পারলে মাসে দেড়'শ দু'শ টাকা আসে।

শওকত কোনো উত্তর দেয়নি সে কথায়।

সে তখন ভাবছিল অন্য কথা। মাস যখন শেষ হয়ে যাবে আর মার্থা যখন বলবে, কই, কত টাকা পেলে। তখন ওকে কী জবাব দেবে শওকত।

না। আজ বুড়ো আহমদ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে তারপর বাড়ি ফিরবে সে।

চটের ঘেরা-দেয়া টিনের রেস্তোরাঁটায় ঢোকার মুখে একটা নেড়িকুত্তা বসে বসে কান চুলকোচ্ছে তার। কয়লার চুলোয় কুণ্ডুলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বাইরে থেকে বুড়ো আহমদ হোসেনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো শওকত। বুড়ো আসর জমিয়ে বসেছে। চেঁচিয়ে কথা বলছে আর হাসছে সে।

শওকতকে দেখে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলো। চোখজোড়া পিটপিট করে তাকালো ওর দিকে। দাড়ির অরণ্যে হাত বুলিয়ে নিয়ে কাউন্টারে দাঁড়ানো ছোকরাকে ডেকে বললো, গেলাসটা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে সাহেবকে এককাপ চা দে। ওর গলার স্বরে বিদ্রূপের ব্যঞ্জনা।

শওকত যেন হোঁচট খেলো।

বুড়ো বললো, এতদিন পর হঠাৎ কী মনে করে।

শওকত সংক্ষেপে বললো, এমনি। বলে বসলো সে।

বুড়ো তখনো ওর দিকে তাকিয়ে। কিছু বলবে?

হুঁ।

কী।

আমি বিয়ে করছি।

বিয়ে? বুড়ো আহমদ হোসেন প্রচণ্ড শব্দে হেসে উঠলো। ওর হাসির চমকে দোরগোড়ায় বসে-থাকা নেড়িকুত্তাটা ঘেউঘেউ করলো। ছোকরার হাতের গ্লাস থেকে কিছু চা ছলকে পড়ে গেলো মাটিতে। বিয়ে করছো কাকে, সে মেয়েটা কে, যার ঠোঁট কামড়ে দিয়েছিলে? ফোকলা দাঁতের ফাঁকে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিলো সে।

বেয়ারা এসে চায়ের গ্লাশটা সামনে রাখলো। গ্লাশটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বুড়ো বললো, নাও, খাও। যাবার সময় অবশ্য পয়সাটা দিয়ে যেয়ো। যাকগে বিয়ে করছো ভালো কথা, কিন্তু সে-কথা আমাকে শোনাতে এসেছো কেন?

শওকত বললো, তোমাকে শোনাতে আসিনি। এসেছি এমনি ঘুরতে ঘুরতে, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাই বললাম।

না। জমলো না। আসল কথাটা মুখ ফুটে বুড়োকে বলতে পারলো না শওকত। আরো অনেকক্ষণ বসে থেকে আরো আজেবাজে কথা বলে যখন বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। রাস্তার দু-পাশের দোকানগুলোতে একটা-দুটো করে বাতি জ্বলে উঠেছে। সহসা নিজেকে কেমন করে হালকা বোধ করলো শওকত। ভালোই হলো। বুড়ো আহমদ হোসেনকে কথাটা বললে হয়তো এখনি ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হতো। একটা অজানা অচেনা অন্ধকার পথ। যার কিছুই জানে না সে। হয়তো একদিন ধীরেধীরে সে-পথের মোড়ে তিলতিল করে নিজেকে হারিয়ে ফেলতো শওকত। ফিরে যাবার ইচ্ছে থাকলেও পথ খুঁজে পেতো না। গুমরে মরতো। তার চেয়ে এই ভালো হলো।

শওকত ভাবলো একবার বাসায় ফিরে যাবে। কিন্তু মার্থার বাসায় ফিরতে অনেক দেরি হবে। রাত বারোটার আগে ফিরবে না সে। অত রাত পর্যন্ত কী করে মেয়েটা। বলছিলো রাতকানা লোকটার সঙ্গে হিসেবের খাতা নিয়ে বসে। রোজ রোজ কিসের হিসেব?

ভাবতে গিয়ে রাস্তায় মোড়ে থমকে দাঁড়ালো শওকত। একটা সন্দেহের রাক্ষস ধীরেধীরে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে ওকে। না না, মার্থা ও-ধরনের মেয়ে নয়। ওকে নিয়ে অকারণে শঙ্কিত হচ্ছে শওকত। মিছেমিছি ওর সম্পর্কে এতসব আজেবাজে চিন্তা করছে সে!

শওকত আবার হাঁটতে শুরু করলো। কতক্ষণ এভাবে পথে-পথে ঘুরলো মনে নেই। ইতিউতি অনেক কিছু ভাবলো সে। তারপর যখন পথে পা বাড়ালো তখন রাস্তাঘাটগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছে। গলির লোকজন অন্যদিন এতক্ষণে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে। কিন্তু আজ সেখানে কিছু প্রাণের সাড়া পেলো শওকত। কুষ্ঠরোগীটা যেখানে বসে

থাকে, সে রকের ওপর অনেকগুলো লোকের ভিড়। শওকত অবাক হলো। বাসার সামনে একটা জিপ দাঁড়িয়ে। আশেপাশে কয়েকজন খাকি পোষাক-পরা পুলিশের লোক। সবার চোখ বাড়ির ভেতরে। শওকতের পায়ের গতি শ্লথ হয়ে এলো। ধীরেধীরে জটলার এক কোণে এসে দাঁড়ালো সে। না, কুষ্ঠরোগীটার কিছু হয়নি। গলিত মাংসের পিণ্ডটা একপাশে গুটিসুটি হয়ে বসে আছে আর পিটপিট করে তাকাচ্ছে সবার দিকে।

বাড়ির সামনে। করিডোরে। উঠোনে লোকের ভিড়। ছেলে বুড়ো মেয়ে। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে সবাই। খলখল করে কথা বলছে। হাসছে। দুঃখ করছে। ওদের কথা শুনে শরীরের রক্তটা ধীরেধীরে হিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগলো ওর।

শওকত অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো। মার্থা।

উঠোনে অনেকগুলো পরিচিত মুখ সন্দেহকাতর চোখে বারবার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে ওর দিকে। শওকতের মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। মার্থা। এ কী করলো মার্থা।

রাতকানা লোকটার দোকান থেকে ওষুধ চুরি করে নিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে মার্থা। ওকে থানায় আটকে রেখে বাসা সার্চ করতে এসেছে পুলিশ। ঘরের মধ্যেও অনেকগুলো চোরাই ওষুধ পাওয়া গেছে। চৌকির নিচে একটা বাক্সের মধ্যে লুকনো ছিলো। আর পাওয়া গেছে একটা টিনের কৌটোর মধ্যে রাখা নগদ সাতশ' টাকা। টাকা আর ওষুধ সব সঙ্গে করে নিয়ে গেছে পুলিশের লোকেরা।

উঠোনের মাঝখানে ঝিম ধরে দাঁড়িয়ে রইলো শওকত। চিন্তার সুতোগুলো যেন একটা একটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবতে পারছে না সে। কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। চারপাশের অনেকগুলো সন্দেহকাতর দৃষ্টি খুঁটে-খুঁটে দেখছে ওকে। হাসছে। কথা বলছে। বিদ্রূপের ধ্বনি জন্ম নিচ্ছে। নাচের মেয়ে সেলিনা। সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে চেপে রাখা উদ্ধত যৌবন তার দিকে চেয়ে-চেয়ে মিটি মিটি হাসছে।

শওকতের মনে হলো ওদের দৃষ্টির নিচে যেন সমস্ত শরীরটা পুড়ে যাচ্ছে ওর। আর বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হয়তো চিৎকার করে ওদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। মার্থা এটা কী করলো !

পরদিন দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে এসে একবার আকাশের দিকে তাকালো শওকত। ওর চোখ সোজা সূর্যের ওপরে গিয়ে পড়লো। সূর্যটি আগুনের মতো জ্বলছে। আর তার লকলকে শিখার উত্তাপে চারপাশের বাড়ির দেয়ালের ইটগুলো গরম হয়ে গেছে। গরমের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঘরের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছে বাড়ির গিন্নীরা। মেঝেটা পানি দিয়ে বারবার ধুয়েমুছে নিচ্ছে কিন্তু গুমোট গরমের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

বাইরে বাতাস নেই।

মাঝে মাঝে হয়তো একটুখানি বইছে। কিন্তু সে হাওয়া গায়ে এসে লাগতে সহসা শিউরে উঠলো শওকত। মনে হলো কে যেন এককড়াই গরম তেল ঢেলে দিলো ওর দেহের ওপর।

রাস্তার পিচগুলো সূর্যের তাপে গলে-গলে সরে যাচ্ছে নর্দমার দিকে। মানুষের পা, মোটর-গাড়ির চাকা আর গরুর খুরের সঙ্গে উত্তপ্ত আলকাতরাগুলো উঠে গিয়ে সমস্ত রাস্তা জুড়ে অসংখ্য ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। রাস্তার পাশে বস্তির একদল ছেলে হল্লা করে মার্বেল খেলছে। অর্ধ-উলঙ্গ দেহ বেয়ে ঘাম ঝরছে ওদের। দূরে একটা বাড়ির কার্নিশের কোণে বসে একা একটা কাক গলা ছেড়ে চিৎকার করছে।

গাছের ডালপালাগুলো একটুও নড়ছে না।

মানুষ গরু সবাই ছায়া খুঁজছে।

শওকতের মনে হলো পুরো শহরটায় যেন আগুন লেগেছে। দালানবাড়িগুলো সকলে আগুনের শিখার নিচে দাউদাউ করে পুড়ে হাই হয়ে যাচ্ছে।

কে জানে মার্থা এখন কোথায়। হয়তো হাজতে কিম্বা কোর্টে। ওর জামিন নেয়ার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ যাবে না। হয়তো মনে-মনে শওকতের কথা ভাবছে মার্থা। ভাবছে সে যাবে। না। শওকত কী করবে কিছু ভাবতে পারছে না।

সে শুধু হাঁটছে। উদ্দেশ্যবিহীন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

তারপর ধীরেধীরে বেলা গড়িয়ে গেলো। গাছের পাতাগুলো একটা-দুটো করে নড়তে শুরু করলো। আকাশের কোণে কয়েক টুকরো মেঘ উঁকি দিলো।

রাস্তায় মৃদুমৃদু বাতাস বইছে। বাড়ির আলিসায় ঝোলানো কাপড়গুলো একটু-একটু দুলছে। অনেক দূরের আকাশে অনেকগুলো চিল বাতাসে ডানা মেলে একবার উপরে উঠছে আর নিচে নামছে। আর মাঝে মাঝে চি চি শব্দে কাকে যেন ডাকছে।

তখনও পথে পথে হাঁটলো শওকত।

রাস্তায় কয়েকটা বাতাসের কুণ্ডলী সৃষ্টি হয়ে ধুলো উড়লো। শুকনো পাতা ডাল থেকে ঝরে ছুটে গেলো। এ-পথের মোড় থেকে অন্য পথের মোড়ে। জানালা-দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। আলিসায় ঝোলানো শাড়িটা পতপত করে উড়ছে। প্রচণ্ড বাতাসের দাপটে পুরো শহরটা যেন ভেঙে পড়তে চাইছে এখন। রাস্তার লোকজন আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে।

প্রথমে বড়বড় ফোঁটা। তারপর প্রচণ্ড বেগে নেমে এলো বৃষ্টি। সামনের বড় রাস্তায় পেছনের ছোট গলিতে। বাড়ির ছাতে। কার্নিশে। বৃষ্টি নেমেছে। সারা গায়ে বৃষ্টি মেখে ঘরে এসে ঢুকলো শওকত। সমস্ত বাড়িতে কোনো মানুষের সাড়া শব্দ নেই। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল এঁটে দিয়েছে ওরা। বৃষ্টির ছাট এসে বারান্দায় পানি জমে গেছে। বাড়ির উঠোনের মধ্যে ঢুকে অনন্ত বাতাস অজগরের মতো ফুঁসছে।

ঘরে ঢুকে ভেজা জামাটা খুলতে যাবে এমন সময় শওকত শুনলো, মাতাল কেরানির বউটা কাঁদছে। মাতালটা চিৎকার করছে আর মারছে ওকে। বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়লো একটা। জানালার পাশে সরে এলো শওকত। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো বন্ধ দরজাটার দিকে।

করুণ বিলাপের স্বরে কাঁদছে বউটা। মাতাল কেরানি এখনো মারছে ওকে। বিদ্যুতের চমক এসে শওকতের চোখে লাগলো। সহসা ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। দৌড়ে গিয়ে একটা প্রচণ্ড লাথি মারলো ভেজানো দরজাটার ওপর। খিল ভেঙে দরজাটা খুলে গেলো।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। আর সেই বিদ্যুতের আলোয় শওকত দেখলো পাশে টেবিলের ওপরে রাখা একটা দা। আর দেখলো মাতাল কেরানি আর তার বউটা একজোড়া শবের মতো দরজার দিকে তাকিয়ে।

শওকতের মাথায় খুন চেপে গেলো। হঠাৎ দাওটা হাতে তুলে নিয়ে মাতালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় ওর মাথায় আঘাত করতে লাগলো। এ যেন তার আজীবন সঞ্চয়-করা আক্রোশ। যেন সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। ভালো-মন্দ পাপ-পূণ্য ভুলে গেছে সব। বাইরে আবার বিদ্যুৎ চমকালো। একটা তীব্র আর্তনাদ করে মাতাল স্বামীর বুকের ওপরে লুটিয়ে পড়লো তার বউ।

মুহূর্তে যে জ্ঞান ফিরে পেলো শওকত। হাতের দা'টা রক্তে চপচপ করছে। মানুষের মগজ ইস্পাতের গা বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। হাতের দা'টা ছুড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো শওকত। লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে ও। রীতিমত হাঁপাচ্ছে। সরু বারান্দাটা পেরিয়ে নিজের ঘরে সামনে আসতে চমকে উঠলো শওকত।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সেলিনা। নাচের মেয়ে সেলিনা। কাঁচা হলুদের মত যার গায়ের রঙ। তামাটে চোখ। গাঢ় বাদামী অধর। শওকতের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটা। বাইরে তখনো বাজ পড়ছে। ঝড় হচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পানির ছাট এসে ভিজে গেছে বারান্দাটা।

হঠাৎ সেলিনার একখানা হাত শক্ত করে মুঠোর মধ্যে ধরে টানতে টানতে ওকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলো শওকত। সিঁড়ি বেয়ে নিচে করিডোরে। করিডোর পেরিয়ে উঠোন। উঠোন পেরিয়ে আরেকটা করিডোর। তারপর রাস্তা। মেয়েটা একটুও বাধা দিলো না। একটা প্রশ্ন করলো না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

রকের ওপরে বসে-থাকা কুষ্ঠরোগীটা বৃষ্টির ছাট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে এককোণে বসে যন্ত্রণায় কোঁকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে একবার তার দিকে ফিরে তাকালো শওকত। তারপর সেলিনার হাতটা আরো শক্ত করে ধরে সেই অন্ধকার রাতে, সেই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সামনে ছুটতে লাগলো শওকত। রাস্তায় পড়ে-থাকা একটা ইটের টুকরোর সঙ্গে হোঁচট খেয়ে অস্ফুট কাতরোক্তি করে মাটিতে ছিটকে পড়লো সেলিনা। দু-হাতে ওকে আবার তুলে নিলো শওকত। তারপর, এই ঝড়, এই বৃষ্টি , এই অন্ধকার আর এই শহরকে দু-হাতে ঠেলতে ঠেলতে আবার ছুটতে লাগলো ওরা। বৃষ্টির আলিঙ্গনে সারা দেহ ভিজে চুপসে গেছে ওদের। এ বৃষ্টি যেন মার্থার চোখের জল। অন্ধকার হাজতে বসে হয়তো তখন নীরবে কাঁদছে মার্থা।

তারপর।

তারপর একটা সুন্দর সকাল।

বুড়ো রাত বিদায় নেবার আগে বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু তার শেষ চিহ্নটুকু এখানে-সেখানে এখনো ছড়ানো। চিকন ঘাসের ডগায় দু-একটা পানির ফোঁটা সূর্যের সোনালি আভায় চিকচিক করছে।

শওকতের বুকে মুখ রেখে, খড়ের কোলে দেহটা এলিয়ে দিয়ে সেলিনা ঘুমোচ্ছে। ওর মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। ঠোঁটের শেষ সীমানায় শুধু একটুখানি হাসি চিবুকের কাছে এসে হারিয়ে গেছে। ওর হাত শওকতের হাতের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে রাখা। দুজনে ঘুমোচ্ছে ওরা।

শওকতের মুখে দীর্ঘপথ চলার ক্লান্তি। মনে হয় অনেকক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজেছিলো ওরা। চুলের প্রান্তে এখনো তার কিছু রেশ জড়ানো রয়েছে।

সহসা গাছের ডালে বুনোপাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেলো। মটরশুঁটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেলো কাছের অরণ্যের দিকে। খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐকতান।

আঠার-জোড়া আইনের পা ধীরেধীরে চারপাশ থেকে এসে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের। ওরা তখনও ঘুমোচ্ছে।